# বাঁচাবো আমার দেশ
# যাবেনা তা শত্রুর দখলে

## সংগ্রামের
## চার দশক

সম্পাদনা
মাহমুদ সেলিম
অমিত রঞ্জন দে
অমিতাভ মহালদার



বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

বাঁচাবো আমার দেশ
যাবেনা তা শত্রুর দখলে

প্রকাশকাল :
অক্টোবর ২০০৯

প্রকাশক :
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী
১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ৭১৬৮৭২৭
Website : www.udichi.org.bd

প্রচ্ছদ : প্রদীপ ঘোষ
বিন্যাস : মিঠু আহমেদ
মুদ্রণ : আরশি প্রিন্টার্স, ১৭৯ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

শুভেচ্ছা মূল্য : ১২০.০০

# সম্পাদকীয়

উদীচীর চার দশক অতিক্রান্ড় হয়েছে। সত্যনদা, ইদুভাই, কামর"ল আহসান খান, মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান, রণেশদার হাতে রোপিত বৃক্ষশিশু আজ বিশাল মহীর"হ। মেহনতী মানুষের গান গাইবার জন্যে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে জন্ম হয়েছিল উদীচীর। সারাবিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে শতাব্দীব্যাপী পরিচালিত যে কঠিন সংগ্রাম; উদীচী সেই সংগ্রামের ধারার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ড় সে সংগ্রাম থেমে থাকার কোনো অবকাশ নেই।

ঊনিশশ' আটষট্টির ঊনত্রিশে অক্টোবর উদীচীর জন্মলগ্নটিতে বাংলার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল আসন্ন মহাঅভ্যুত্থানের সংকেত। সেই শংকাত্রস্ড় তমসায় ধ্র"বতারার মতো জ্বলে উঠলো উদীচী এদেশের সংগ্রামী মানুষকে সংগ্রামের সঠিক পথটি চিনিয়ে দেয়ার জন্যে। গ্রামে-গঞ্জে মাঠ-প্রান্ড়রে, কলে-কারখানায় উদীচী ছুটে বেড়ালো গান আর পথনাটক নিয়ে। ঊনসত্তরজুড়ে উদীচী পথে পথে, যেখানেই মিছিল, যেখানেই সংগ্রাম সেখানেই উদীচী লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস, বুলেট-বেয়নেট উপেক্ষা করে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে উদীচীর কর্মীরা যুদ্ধে নেমেছে কেউ সরাসরি অস্ত্র হাতে, কেউ কণ্ঠে নিয়ে গান। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশগড়ার সংগ্রাম। উদীচীর কণ্ঠে তখন দেশগড়ার গান– শোনেন দেশবাসী ভাই, সোনার দেশগড়তে হইলে সোনার মানুষ গড়া চাই'– অথবা 'চলো ভাই একসাথে যাই ক্ষেত খামার'– অথবা পথনাটক– 'সাচ্চা মানুষ চাই'।

ঊনিশশ' পঁচাত্তরে জাতির জীবনে নেমে এলো ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে। স্ড়ব্ধ জাতি। স্ড়ব্ধ দেশ উদীচী এখানেও এগিয়ে এলো পথিকৃতের ভূমিকায়। পঁচাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শিল্পকলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে উদীচী জানালো তীব্র হুঁশিয়ারি– গানে গানে–'এদেশ বিপন্ন! বিপন্ন আজ!! বঙ্গবন্ধুর পাইপ, চশমা আর উচ্চতাকে প্রতীক করে জানালো মৌন প্রতিবাদ। উনিশশ' ছিয়াত্তরের ষোল ডিসেম্বর মঞ্চস্থ করলো ইতিহাস কথা কও– বাংলার সুদীর্ঘ মুক্তির সংগ্রাম আর বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত সাহসী গীতিআলেখ্য।

উদীচী হলো সামরিক স্বৈরাচারের রোষের শিকার। ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হলো উদীচীকে। কিন্তু উদীচীকে সংগ্রাম থেকে, সত্যভাষণ থেকে বিরত করা গেল না। তারপর ঊনিশশ' ছিয়াত্তর থেকে ঊনিশশ' নব্বই দুই সামরিক শাসকের কালো শাসনকাল জুড়ে উদীচী সারা দেশে গড়ে তুলেছে সুতীব্র সংগ্রাম। গানে-নাটকে

কবিতায় উজ্জীবিত করেছে মানুষকে। সুতীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে মৌলবাদী জঙ্গি অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে। আর তাই মৌলবাদীরা প্রথম আঘাতটি হেনেছে উদীচীর উপরই। ঊনিশশ নিরানব্বই-এর ছয় মার্চ উদীচীর দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে শেষদিনে গভীর রাতে হাজার হাজার মুগ্ধ শ্রোতাদর্শকের সঙ্গীত সুধাপানরত অবস্থায় নৃশংস বোমা হামলায় কেড়ে নিয়েছে দশটি তাজা প্রাণ শিল্পীকর্মীকে, পঙ্গু করেছে আরও বহু মানুষকে। দুহাজার এক সালের নির্বাচনে প্রশ্নবিদ্ধ বিজয় অর্জন করার পর চারদলীয় জোটের পশুরা যখন সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল– উদীচী সারাদেশে সর্বপ্রথম নগ্নপদে মিছিল করে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

উদীচীর চারদশকের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে এমনি আরও বহু ছোট বড় সংগ্রামের ঘটনায়। আজ তাই উদীচী দেশের মানুষের কাছে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনি দেশে কোনো অন্যায় ঘটে তখনি মানুষ বলে– উদীচী নিশ্চয়ই পথে নামবে।

সেই পথেই উদীচী, সংগ্রামের উদীচী, ঝাঁকের উদীচী, প্রতিবাদের উদীচী অব্যাহত রাখবে তার অবিরাম পথচলা। কারণ মানুষের মুক্তি এখনো আসেনি। আমরা যা চাই তা এখনো অর্জন করিনি। তাই –'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবেই।' তবে চার দশকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে উদীচীর বিগত দিনের কর্মকাণ্ড, তার অর্জন, সাফল্য-ব্যর্থতা নিশ্চয়ই মূল্যায়নেরও দাবি রাখে। উদীচীর সংগ্রামের চার দশক নিয়ে লিখেছেন যারা এতোদিন উদীচীকে দেখেছেন ভিতর থেকে বাহির থেকে, কাছে থেকে দূরে থেকে। এ সংকলনে গ্রন্থিত লেখাগুলো শুধু উদীচীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ বা উদীচীর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নই নয়, এ চার দশকে এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরও স্মারক।

# সূচিপত্র


**যে ভাষার আদি শব্দ মঞ্জুরির একটি শব্দ লাঙ্গল** ৭
রণেশ দাশগুপ্ত
**উদীচীর ৪০ বছর পুর্তিতে** ১০
যতীন সরকার
**চলিণ্চশোত্তর উদীচীকে হার্দ্যিক শুভেচ্ছা** ১৩
কামাল লোহানী
**ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন ও উদীচীর ৪০ বছর** ১৮
গোলাম মোহাম্মদ ইদু
**বিপণ্চবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উদীচী** ২৯
মনজুর"ল আহসান খান
**বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ** ৩৩
হাসান আজিজুল হক
**মধ্যবিত্তের গণ-সংস্কৃতি বনাম জনগণ সংস্কৃতি** ৩৯
সৈয়দ হাসান ইমাম
**অঙ্গীকার আর অসঙ্গতি** ৪৪
আবুল মোমেন
**সত্যেন সেনকে খোলা চিঠি** ৪৯
মামুনুর রশীদ
**'উদীচী' এক নক্ষত্রের নাম** ৫২
নাসিরউদ্দীন ইউসুফ
**উদীচীর অবিরাম পথচলা** ৫৪
কামর"ল আহসান খান
**শিল্পীর দায়বদ্ধতা** ৫৭
ড. সফিউদ্দিন আহমদ
**জাতীয় চেতনা ও শিল্পকলা : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত** ৬৬
আবুল মনসুর
**উদীচীর চার দশক** ৭১
রতন বসু মজুমদার
**বাংলা মাস ও বছর** ৭৩
সুব্রত মজুমদার
**এই তো সময়** ৭৭
কবি আসাদ চৌধুরী

**ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক** ৭৮
কাজী মদিনা
**উদীচী : এক আলোকবর্তিকা** ৮১
এ এন রাশেদা
**সত্যেন সেন, উদীচী ও বাংলাদেশ** ৮৪
মতলুব আলী
**উদীচী** ৮৮
দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়
**উদীচীর পথ ধরে** ৯২
রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা
**স্বাধীনতা, সাম্য, শান্ড়ি ও মৈত্রীর এক পথিকৃত উদীচী** ৯৬
ফকির আলমগীর
**উদীচীকে আরও আনেক দূর যেতে হবে** ১০০
নিরঞ্জন অধিকারী
**উদীচী : বিপণ্ঢবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার** ১০২
মাহমুদ সেলিম
**চার দশকের সংগ্রামী উদীচী** ১০৯
রতন সিদ্দিকী
**একটি দুটি সহজ কথা** ১১২
অলোক বসু
**উদীচীর ৪১ বছর ঃ পেছন ফিরে দেখা** ১১৫
হাবিবুল আলম
**উদীচীর নাটক - অন্য মাত্রায়, অন্য চিন্ড়য়** ১১৮
আরিফ হায়দার
**র"খে দাঁড়াতে হবে** ১২১
জামসেদ আনোয়ার তপন
**সংস্কৃতির সংগ্রামে উদীচী** ১২৩
অমিত রঞ্জন দে

# যে ভাষার আদি শব্দ মঞ্জুরির একটি শব্দ লাঙ্গল

রণেশ দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষার শব্দ মঞ্জুরির একটি শব্দ লাঙ্গল। এই শব্দ বিশেষ করে লাঙ্গল যার জমি তার দাবির মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ দশকের একটি বিপ্লবাত্মক শব্দ। কাজী নজরুল ইসলাম এই লাঙ্গলের জয়গান গেয়েছেন। পুঁজিবাজী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, নিপীড়িত দরিদ্র রিক্ত কৃষকদের সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন তিনি তার বিখ্যাত কবিতায় 'ওঠরে চাষী জগৎবাদী ধর কষে লাঙ্গল'। এই বিপ্লবী শব্দের বয়স কিন্তু হয়েছে অনেক। কয়েক হাজার বছর। এ যেন বাংলার কাননের একটি ফুল। যাকে একই পথে ডাকা হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। এ যেন হাজার হাজার বছরের একটি মুক্তা, যার অঙ্গ থেকে একটি অণুকণাও খসে পড়েনি। হাজার হাজার বছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল আজও অবিকল তেমনি আছে। সেসব শব্দ যুগে যুগে বাংলা ভাষার ঐক্যের আর বিশেষ সত্তার ধারাটিকে মুক্ত রেখেছে নানা ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে, তাদের একটি এই লাঙ্গল। কখনো কোন পর্যায়ে এই শব্দটি স্মৃতির বাইরে চলে যায়নি, ব্যবহারের বাইরে পড়েনি।

এই লাঙ্গল শব্দটির মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাসের কয়েক হাজার বছরের টানাপোড়েন সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাওয়া যায়। কয়েক হাজার বছর আগে বাংলাদেশের বাসিন্দারা বাংলা ভাষার যে আদলটিকে ব্যবহার করতো তার শব্দ মঞ্জুরিত অনেক শব্দে ব্যবহার বিভিন্ন কারণে লুপ্ত হয়েছে। একটি কারণ এই যে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা, তার নানা দরকারি উপকরণ এবং এদের ঘিরে উৎপাদন উৎপাদকদের যে অবস্থান ও সম্পর্ক এই তিনের যোগাযোগের প্রয়োজনেই কথা বলা বা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার উপকরণ সম্পর্কিত। শব্দ মজুরির রদবদল হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিত্যক্ত উপকরণে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ নতুন শব্দ ব্যবহার এসেছে। এরা জায়গা নিয়েছে পরিত্যক্ত শব্দের। এইভাবে হাজার হাজার বছরের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিকাশের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হতে হতে অনেক শব্দ স্মৃতি থেকেও হারিয়ে গিয়েছে। কাজেই যখন লেখার যুগ এসেছে তখন স্মৃতি থেকেও এই ধরনের অব্যবহৃত শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হওয়ার উপায় থাকেনি।

দ্বিতীয় এক কারণেও আদিবাসিন্দাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলার ভূমিখণ্ডে হাজার হাজার বছর আগে পর্যায়ের পর পর্যায়ে আদিবাসিন্দাদের পাশাপাশি যেসব নরগোষ্ঠী এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং নিজ নিজ ভাষার ভাণ্ডার ও আদলের মধ্য থেকে দিয়ে অথনৈতিক সামাজিক জীবনে নতুন নতুন শব্দের

প্রয়োজন মিটিয়েছে, তারাও প্রথমত প্রচলিত শব্দের জায়গায় নতুন শব্দান্ড়র ঘটিয়েছে। দ্বিতীয়ত এরা কোন কোন শব্দের ধ্বনিগত আদল বদলে দিয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বিশেষ ধারার সম্মিলন ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে কোন কোন শব্দের এমন রূপান্ড়র ঘটেছে যে বিশ শতকের বাংলার শব্দ মঞ্জুরির মধ্যে তাকে আর পুরোনা রূপে চিহ্নিত করা যায় না। শুধু তাই নয়, যখন থেকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তখনই প্রায় হাজার বছর আগের পুরানো রূপকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

এই ধরনের রূপান্ড়রের স্রোতে পড়েও লাঙ্গল শব্দটি বদলায়নি। লাঙ্গল শব্দটি হয়েছে ইতিহাসের সাক্ষী। ইতিহাসের টানাপোড়েনের ব্যাপারে লাঙ্গল শব্দটি নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক থেকে আলো ফেলতে পারে;

১। যেসব নরগোষ্ঠীকে দিয়ে বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে আদিতম একটি নরগোষ্ঠীর বয়স এই লাঙ্গল শব্দটিতে পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালি জাতির বয়স এদিক থেকে কয়েক হাজার বছর।

২। বাংলায় লাঙ্গলের ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই।

৩। যে কৃষি শ্রমজীবীরা হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারক রূপে কাজ করে এসেছে, তারা সমস্ড় রাজকীয় নবাব জোতদার জমিদার ও তাদের রক্ষক সম্রাট, বাদশা ও ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে শোষিত ও নিপীড়িত হলেও বাংলা ভাষা ব্যবহার্য শব্দের মূল ধারাতে বাজায় রেখেছে।

৪। মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম সারা দেশের নিপীড়িত কৃষক সমাজকে কী করে জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক বৃত্তে তড়িৎবেগে উপনীত করতে পারলো তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই যে, মাতৃভাষা নিপীড়িত গ্রামীণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার স্বতস্ফূর্ত মাধ্যম রূপে কাজ করে এসেছে।

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে সাম্যবাদী সমাজের পক্ষে নিয়োজিত হতে বাধ্য এবং কৃষক সমাজের বিশেষ করে নিপীড়িত ভূমিহীন ও দরিদ্র বৃহৎ অংশ যে এই লক্ষ্য অর্জনের কাজে অন্যান্য সমস্ড় শ্রমজীবীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে আত্মনিয়োগ করবে, তার জন্য কাজ করবে ক্রমবর্ধমান চেতনার ক্ষেত্রে ঐক্য। এই চেতনার ঐক্যকে সংহত করবে সমস্ড় বৈপণ্ঢবিক কর্মকাে মাতৃভাষার বৈপণ্ঢবিক প্রয়োগ। এখানেও সক্রিয় থাকবে জনগণের নাড়ির যোগ। লাঙ্গল শব্দ তার স্মারক।

*প্রয়াত রণেশ দাশগুপ্তের এ লেখাটি ব্যারিস্টার বাদল রশিদ সম্পাদিত ''সাপ্তাহিক কৃষক'' পত্রিকার একুশ ফেব্রুয়ারি পঁচাত্তরের সংখ্যায় প্রকাশের জন্য তাঁর কাছ থেকে আনা হয়েছিল। ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে পত্রিকাটি বাজারে যেতে পারেনি। তাই রণেশ দাশগুপ্তের এ লেখাটি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা এ অপ্রকাশিত নিবন্ধটি মুক্তকণ্ঠ সম্প্রতি প্রকাশ করে। প্রয়াত রণেশ দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে উদীচী কার 'সংগ্রামের চারদশক'- এর সংকলনে নিবন্ধটি পুনঃ প্রকাশ করলো।*

# উদীচীর ৪০ বছর পুর্তিতে

যতীন সরকার

উদীচী শব্দটির অর্থ উত্তর দিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'উদীচী' রবীন্দ্রচিন্ড্রাত সত্যেন সেন যে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তার নামও উদীচী রেখেছিলেন তার প্রত্যক্ষ কারণ, সংগঠনটির গোড়াপত্তন ঘটেছিল পুরনো ঢাকা নগরীর উত্তরদিকের নারিন্দার একটি বাসায়। তবে এ নামকরণের আসল তাৎপর্যটি আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। উত্তর দিকেই থাকে ধ্রুবতারা। আগেকার দিনে সেই ধ্রুবতারা লক্ষ্য করেই আঁধার রাতে নাবিকরা তাদের গন্ড়ব্য ঠিক করে নিত। সেরকম একটি লক্ষ্যই ছিল 'উদীচী' শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করার মূলে। সেই মূলীভূত তাৎপর্যটির কথা স্মরণ না রাখলে আর দশটি সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে উদীচীর পার্থক্যটি কোনমতেই উপলব্ধি করা যাবে না।

হাঙ্গেরীয় দার্শনিক লুকাচ বলেছিলেন, সংস্কৃতিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য, রাজনীতি সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র, তেমন অনুভূতিই কাজ করেছিল সংস্কৃতি সাধক ও বিপ- বী রাজনীতিক সত্যেন সেনের চৈতন্যে। গান-নাচ-নাটক-আবৃত্তি চিত্রকলার মতো সুকুমার শিল্প চর্চাকেই আমরা সাধারণ সংস্কৃতিচর্চার চূড়ান্ড় রূপ বলে ধরে নেই এবং এরকম সংস্কৃতিচর্চা প্রায়শই কলাকৈল্যবাদকে আশ্রয় করে, আর তাতে সংস্কৃতিচর্চার আসল তাৎপর্যটিই চাপা পড়ে যায়। এরই ফলে সংস্কৃতি ও রাজনীতির মধ্যে ঘটে যায় চূড়ান্ড় বিভাজন। আমাদের অধিকাংশ সংস্কৃতিসেবী যেমন রাজনৈতিক চেতনাবিহীন, অধিকাংশ রাজনীতিকের মধ্যেও তেমনই সাংস্কৃতিক বোধের অনুপস্থিতি প্রকট। এ অবস্থাটি যে কোনমতেই কাঙ্ক্ষিত নয়, সত্যেন সেন তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্বে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যখন একটি বৈপণ্ঢবিক রূপান্ড়রের আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটছিল, অথচ সে আকাঙ্ক্ষাটিকে বাস্ড়ব করে তোলার সঠিক পথটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখনই সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠা করলেন 'উদীচী'। সংস্কৃতি কর্মীদের বৈপণ্ঢবিক রাজনীতি-চেতনায় অভিষিক্ত করা ও রাজনীতিকদের ভেতর সুস্থ সংস্কৃতির বোধ প্রবিষ্ট করে দেয়া–সত্যেন সেনসহ উদীচীর প্রতিষ্ঠাতাদের এরকমটিই ছিল আত্যন্ড়িক অভীপ্সা। প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পরও উদীচীর শিল্পী-কর্মীদের চিত্তে সেই অভীপ্সাটি অমলিন রয়ে গেছে। একালের একজন উদীচী কর্মী অমিত রঞ্জন দে উদীচীর প্রতিষ্ঠা ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের কথা স্মরণ করে লিখেছেন "ধর্মান্ধতা ও কূপমন্ডুকতার কুয়াশা ভেদ করে মানুষকে জাগানোর জন্য, ঘুম ভাঙানোর জন্য, তাদের বৈপণ্ঢবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষকে

অধিকার সচেতন করে তুলতে এবং গোটা জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে শিল্পী সংগ্রামী সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, গোলাম মোহাম্মদ ইন্দু, সাইদুল ইসলাম, মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। গঠনপর্বের প্রাক মুহূর্তে শিল্পী সাইদুল ইসলামের নারিন্দার বাসায় ৬-৭ জন শিল্পী-কর্মী একত্রিত হয়ে মহড়া শুর“ করেন 'ওরে ওরে বঞ্চিত সর্বহারা দল'।" বঞ্চিত সর্বহারার মর্মজ্বালাকে কণ্ঠে ধারণ করে উদীচীর জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই সারাদেশের মানুষ দুঃশাসনের বির“দ্ধে ফুঁসে উঠেছিল, ঘটেছিল উনসত্তরের সেই বজ্রগর্ভ গণঅভ্যুত্থানে এবং এর দু'বছর পরেকার সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে উদীচীর শিল্পী কর্মীদের ছিল প্রেরণাসঞ্চারী ভূমিকা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতার মৌল চেতনায় জাতিকে জাগ্রত করে রাখারই কার্যক্রম গ্রহণ করে উদীচী। কয়েক বছর যেতে না যেতেই যখন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নির্মমভাবে নিহত হন সপরিবারে, নিহত পাকিস্ড়ানের ভূত যখন চেপে বসে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘাড়ে, তখনও উদীচী তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে শিল্পের অস্ত্র হাতে নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন উদীচীর শিল্পীসংগ্রামীরা। মাহমুদ সেলিমের 'ইতিহাস কথা কও' শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারী গীতি-আলেখ্যই ছিল না, এর ভেতর দিয়েই প্রথম তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্ড়ানের ভূত তাড়ানোর মন্ত্র। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ উদীচী যখন 'ইতিহাস কথা কও' নিয়ে পথে নেমেছিল তখনও তো মুজিবভক্তির ধ্বজাবাহী রাজনৈতিকদের মুখে কুলুপ ও দরজায় খিল আটাই ছিল। শুধু সেলিমের 'ইতিহাস কথা কও নয়', সেন্টু রায়ের 'দিন বদলের পালা' কিংবা ১৯৭৭ এর একুশে ফেব্র“য়ারিতে উদীচী পরিবেশিত গীতি-নৃত্যনাট্য আলেখ্য 'জানি রক্তের জোয়ারে জাগবে সুখের বান' ও কি সেদিনকার স্ড়দ্ধতাকে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে যায়নি?

এ তো উদীচীর কয়েকটিমাত্র পারফরমেন্সের কথা। উদীচীর প্রতিটি নাটক গীতি-আলেখ্য আবৃত্তি কিংবা সঙ্গীতের পরিবেশনাই তো শিল্পের মাধ্যমে বলিষ্ঠ জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটায় ও শিল্পভোক্তার চৈতন্যে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। বর্ষবরণ বা ঋতু উৎসব বা নবান্ন কিংবা কোন প্রতিবাদী সংস্কৃতি সংগ্রামে উদীচী একলা থাকতে চায় না। সমমনদার ডেকে এনে বা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সংগ্রামী সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করে তোলার দিকেই তার প্রবণতা। সংস্কৃতি উদ্যানে উদীচী শতফুল ফুটতে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। তাছাড়া, মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিচর্চা বলতে শুধু গান-নাটক, আবৃত্তি বা গীতি-আলেখ্যের পারফমরমেন্সকেই বোঝায় না। হাঁ, পারফরমেন্সের মধ্য দিয়েই যে উদীচীর পরিচয় সারা বাংলাদেশে এবং পশ্চাত্যেরও কোন কোন নগরে বিস্তৃত হয়েছে, এ কথা ঠিক। উদীচীকে তো অনেকে গণসঙ্গীতের একটি সংগঠন বলেই মনে করে। উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন সেন নিজেও তো ছিলেন গণসঙ্গীতের স্রষ্টা ও পরিবেশক। তাঁর গানেরই সেই বিখ্যাত দুটি চরন-

‘মানুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী, তাই দিয়ে রচি গান-
মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যার মানুষের দেয়া প্রাণ’।

তবে কেবল গান দিয়েই যে মানুষের প্রাণের সার্বিক উজ্জীবন ঘটানো যাবে না উদীচী সে কথাও জানে। তাই উদীচী তার শিল্পীকর্মী সংগঠক সমর্থকদের বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ বহিঃপ্রকৃতির ও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সংস্কার সাধনের মধ্যে দিয়ে যা সম্পন্ন হয়, তা-ই সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি সাধনার জন্য আদর্শগত ও প্রয়োগগত শিক্ষা গ্রহণ না করালে চলে না। শিক্ষিত সংস্কৃতি কর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়েই দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণ সূচিত হতে পারে এবং এটি মোটেই উদীচীর একক কর্ম নয়। সারাদেশে যেসব প্রগতি চেতন সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে, কিংবা যেসব সাংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের কথা ভাবেন, এরকম সবার সক্রিয় সম্মিলনের প্রয়োজন আজকে অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

এখনই, এই মুহূর্তে, এই সম্মিলন না ঘটলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। অন্ধকারের সব শক্তি আজ একাট্টা। তারাই তো সুস্থ সংস্কৃতির সব নীতি দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ছায়ানটের নববর্ষের অনুষ্ঠানে, যশোরে উদীচীর সম্মেলনে নেত্রকোনা উদীচী ভবনে হামলা চালিয়ে অনেক তাজা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে ওরা অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের নামতেই হবে। সেই যুদ্ধে নামার জন্যই উদীচী তার চল্লিশ বছর পূর্তিতে আলোর পথের সব যাত্রীকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

# চলিণ্ঢশোত্তর উদীচীকে হার্দ্যিক শুভেচ্ছা

কামাল লোহানী

এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী একটি সংগ্রামের নাম, যে সংগ্রাম চলেছে চলিণ্ঢশ বছর ধরে, চলবে অবিরাম। উদীচী বলছে সে সংগ্রামের কথা যে নিরন্ড়র। মানুষের সংস্কৃতি বিস্তৃত লোক-লোকালয়ে, ক্ষেতখামারে, কলে কারখানায়। কিষাণ মজুরের নিত্যদিনের সুখ দুঃখে, লড়াই সংগ্রামে তার সৃষ্টি। সংগ্রাম অর্জনের। নবজীবন প্রতিষ্ঠার জয়গানে। এ সংস্কৃতি তাই রাজনীতিরই সম্পূরক। এমনই মন্ত্রে উজ্জীবিত একটি সংগঠন চলিণ্ঢশ বছর ধরে পথে আছে। তাকে রক্তিম সেলাম। আজ তার চার দশক পূর্তিতে জনগণের প্রাণঢালা অভিনন্দন। এইতো সেই সংগঠন, যার যাত্রা হয়েছিল ২৯ অক্টোবর ১৯৬৮ সালে মনীষী লেখক-সাংবাদিক সংগঠক সত্যেন সেনের প্রদীপ্ত আদর্শের পথ ধরে। আজ সেই সংগঠনের দুস্ড়র পথযাত্রায় অবিরাম সংঘর্ষে তাবৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ তার– অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত। সাম্য আর মৈত্রীর জয়গান গেয়ে, জীবন জয়ের অবিরাম যুদ্ধে চলিণ্ঢশটি বছর পেরিয়ে উদীচী যাঁদের নেতৃত্বে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে ভাঙতে চেয়েছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছে আজও সে পথের শেষ হয়নি। চলতেই হবে তাকে তবু, কারণ সেতো অঙ্গীকারাবদ্ধ দুঃখী মানুষের কাছে, মেহনতি জনতার ঐক্যে। তাইতো সে জড়িয়ে পড়েছে উত্তরে নয় কেবল, পূবে পশ্চিমে দক্ষিণেও, ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র।

গণমানুষের বন্ধু সত্যেন সেন যার স্রষ্টা, সেই যে সংগঠনের হাল ধরেছিলেন ঋষি রণেশ দাশগুপ্ত, যাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল অবিনাশী গণশক্তির উপর। তিনি লেখক ছিলেন প্রগতির, চেয়েছিলেন শোষণহীন নয়া দুনিয়া। তিনি আজ নেই কিন্তু তার সংগঠন আজও রাজপথ দখল করতে সিদ্ধ। সৃষ্টি যার পাকিস্ড়নী ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে, উন্মত্ত রাজনৈতিক যুদ্ধের কালে। পাকিস্ড়ন রাষ্ট্রের আয়ু আমাদের এ পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে প্রায় শেষ। সেই কালেই যথার্থ শক্তির নতুন ফ্রন্টে সংগ্রামের রক্তিম পতাকা হাতে সামিল উদীচী।

পাকিস্ড়নের শোষণ নিপীড়নকে উপেক্ষা করে যে উদীচীর প্রতিষ্ঠা সেই অগ্নিগর্ভ দিনে, সেই সংগঠনটি আগুনে পুড়ে গনগনে লাল লৌহখন্ডের মতন প্রদীপ্ত আজ গণসংস্কৃতির লড়াইয়ে। চলমান পুঁজিতাড়িত সাম্রাজ্যলোভী পরাশক্তির দাপটে জর্জরিত এই দুনিয়া, আগ্রাসী যুদ্ধলিপ্সা, আর স্বদেশী পিশাচ ও ভোগবিলাসী লোভাতুর চক্রের সীমাহীন ঔদ্ধত্য পৃথিবীর বহু দেশের মতন আমাদের এই ছোট্ট দেশটার বিপুল জনগণকে পদানত করে রাখবার নিরন্ড়র ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে।

সেই গণদুষমনদের। লড়ছে যে দু একটি, গণসংস্কৃতি সংগঠন, উদীচী তাদেরই একটি, সুসংগঠিত বিস্তৃত দেশজুড়ে প্রবল শক্তির উৎস হয়ে তাইতো গণবিরোধী শাসনলোভী চক্রের অবিরাম আক্রমণের শিকার উদীচী। তবু উদীচীর পথচলাকে স্তব্ধ করতে পরেনি। চার দশক পেরিয়ে চলেছে সে সামনের দিকে, লক্ষ্য একটাই মানবমুক্তি। শোষণহীন সমাজ চাই। সংগ্রামের সহযাত্রী মেহনতি মানুষের দুনিয়া কায়েম করতেই হবে, এই তাঁদের অঙ্গীকার। এই পথ পরিক্রমায় উদীচী যাঁদের সাথে পেয়েছিল, তাদের শীর্ষে হলেন গণগায়ক কলিম শরাফী, সাহিত্যিক শহীদজায়া পান্না কায়সার, বিদগ্ধজন হায়াৎ মামুদ আর সুঅভিনেতা হাসান ইমাম। অধ্যাপক যতীন সরকার এখন তার হালে বসে আছেন, দৃঢ় হাতে দাঁড় টানছেন। অমন সুবক্তা, রসিক জন, সাহিত্যিক-শিক্ষক, রাজনীতিক মেলে কৈ। ব্যতিক্রম এই মানুষটি থাকেন গ্রামাঞ্চলে, নেত্রকোনায় এত বিস্তৃত সংগঠনের চূড়ামনি শহরে থাকেন না, গ্রাম থেকে নেতৃত্ব দেন, মাঝে মধ্যে যে আসেন না, তা নয়। কিন্তু এমন সংস্কৃতি ফ্রন্টের বিপুল বাহিনীর সচল ঐক্যবদ্ধতাই বুঝি টিকিয়ে রাখছে বিশাল সংগঠনকে। আর তাই অধ্যাপক যতীন সরকার সাহসের সাথে ধরেছেন হাল। সংগঠনতো বহুজনের সম্পত্তি। বিবাদ বিসম্বাদ-থাকতেই পারে, মতবিরোধ যদি নাই থাকবে তবে আমাদের মতন উন্নয়নকামী দেশে এমন সংগঠনগুলো চাঙ্গা তাগড়া হয়ে উঠবে কী করে? বহুমতের ঐক্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আর সেই বহুজনই হন সংগঠনের শক্তি যে ঐক্যই সংগ্রামকে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়। সংঘশক্তির রূপই তো সংগঠন। তাই উদীচীও একটা সময় নেতৃত্বে দুর্বলতায় নিমজ্জিত হয়েছিল বটে কিন্তু সচেতন কর্মীবাহিনীর প্রবল বিশ্বাসে আবার দেশে এবং বিদেশেও উদীচী সোচ্চার, বিস্তৃত, সম্প্রসারিত।

চলিণ্চশতম প্রতিষ্ঠাবর্ষ শেষে উদীচী আজ নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত শিল্পের সংগ্রামে জীবন জয়ের লড়াইয়ে। সম্ভবত উদীচীই একমাত্র সংগঠন, যার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত দেশময় এবং দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ বিভুঁইয়েও। এমন কমিটমেন্ট কোন সংগঠনের আছে? নেই কারো। তাই উদীচীর যুদ্ধজয়ের সংগ্রাম প্রচণ্ড প্রবল।

এদেশে বৃটিশ আমলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আইপিটিএ কে নির্যাতন সইতে হয়েছিল বারংবার। পাকিস্তানে একই ধারায় সংগঠিত অগ্রণী শিল্পী সংস্থা, গণনাট্য সংস্থা, যুবলীগের গণসঙ্গীত স্কোয়াড কিংবা তখনকার ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীকে তাড়া করেছে প্রশাসন। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে মেনে নিতে চায়নি পাকিস্তানীরা, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হল পূর্ববঙ্গ। ক্রান্তি, ছায়ানট, সংস্কৃতি সংসদ। কিন্তু যে হত্যাযজ্ঞ নেমে এসেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর এই বাংলায় তা কিন্তু আর কোন সংগঠনকে মোকাবিলা করতে হয়নি। উদীচী বহুদিন থেকেই সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পিশাচ শক্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে বার বার যশোরে, নেত্রকোনায়, জগন্নাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ে। যশোরের হামলায় বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ দিয়েছেন লোকশিল্পী, সহযাত্রী সাধারণ মানুষ যাঁরা দর্শক ছিলেন যশোর টাউন হল ময়দানের রাতের অনুষ্ঠানে হাজারে হাজার। নেত্রকোনায় শেলী আর হায়দারের মতন বলিষ্ঠ দুই সংগঠককে হারিয়েছে উদীচী। কত যে আহত হয়ে আজও পঙ্গু হয়ে আছেন! এইতো সেদিন জগন্নাথে শিবিরের হামলায় অনুষ্ঠান নয় সম্মেলনকেই প করতে কিন্তু পারেনি। জখম করেছে বহুজনকে। কারণ উদীচী গণমানুষের সংগঠন। তাঁদের কাছেই পৌঁছতে চায়। আর সে কারণেই গণবিরোধী চক্রের আক্রোশ এই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনেরই উপর। ছায়ানটের রমনা বটমুলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে একই মৌলবাদী হামলা হয়েছিল আজ থেকে সাত বছর আগে। সেখানেও সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিলেন দশজন। এমন নিরীহ প্রাণ বলিদান চলছেই এই একাত্তরে পরাজিত শাসক শক্তির চক্রান্েড়। তার কারণ, মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের আপামর জনসাধারণ গণঐক্য প্রতিষ্ঠা করে একদ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি শতধা বিভক্ত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অথবা ক্ষমতা প্রত্যাশী দল যুদ্ধাপরাধী জামাত, শিবির, আলবদর, আল শামস ও রাজাকারদের বিচার করে শাস্িড় বিধান করতে পারেনি বলেই ওদের স্পর্ধা বেড়ে সীমাহীন ঐদ্ধত্যে পরিণত হয়েছে। আজ মুক্তিযুদ্ধকেই অস্বীকার করছে এমনকি মুক্তিযুদ্ধ হয়নি হয়েছে গৃহযুদ্ধ এমনও বলতে সাহস দেখাচ্ছে। এরা স্পর্ধার সাথে বলছে এ দেশে কোন 'স্বাধীনতাবিরোধী' নেই। মিথ্যাচার করতে ওদের কোন লজ্জা নেই। মানুষকে ধোকা দেয়াই যাদের কাজ। সেই হিংস্র মৌলবাদীরা এবার সেই পাকিস্ড়ানীদের মতই লোক সংস্কৃতির উপর হামলা চালিয়েছে। আর ওদের খুশী করার জন্য সরকারের বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আর পুলিশ ঐ ভাস্কর্য শিল্পকর্মকে সরিয়ে ফেলেছে। ক'জন মাদ্রাসা ছাত্রের অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে ওরা যে নতুন নাটক রচনা করল তা সারাদেশে দারণ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই ক্ষোভকে আমরা ক্রোধে পরিবর্তন করতে পারি না। আর পারি না বলেই এমনি ঘৃণ্য ন্যাক্কার জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় আমাদের। আমরা কেন এই প্রতিবাদ কেবল ঘরে বসে বিবৃতি বক্তৃতা দিয়ে করতে চাই, কেন আমাদের গোলটেবিল, মতবিনিময় ইত্যকার আন্দোলন বিমুখ কর্মকা পরিহার করে আজও সংগ্রামের ঐক্য এবং প্রতিরোধের মিছিলে সামিল হতে নিজেরা পারছি না, কেন জনগণকে আহবান জানাতে দ্বিধা করছি? তবে কি ভয় 'আমাদের লাভের গুড় পিঁপড়া খাবে'? আমাদের লাভের লোভ নেই। রাজনীতি যারা সংসদীয় নির্বাচনের জন্য করছে, তাদের লোভ ঐ বিজয় অর্জনের তাই লাভের আশায় বসে থাকেন সেইসব নির্বাচন প্রত্যাশীরা 'আঙ্গুর ফল' এর দিকেই। কিন্তু আমরা যারা জনগণ আমাদেরতো কোন লোভ নেই। আমরাইতো বিবেক বুদ্ধির বিবেচনায় ভালো মানুষ বলেই রাজনীতিকদের ভোট দেই জিতবার জন্য। তাঁরা জেতেন, কিন্তু বিজয়ের পর তাঁরা মজা লোটেন সকল সুযোগ আর সুবিধার। যাদের জন্য তাদের বিজয় এবং যাদের জন্যেই কাজ

করার প্রতিশ্র"তি দিয়েই বিজয়ী হন তারা, নির্বাচনের মতন সংক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে যাবার পর যাদের কাছে ভোটের আগে কর"ণা ভিক্ষা করেছিলেন, তাদেরই ভুলে যান।

সংস্কৃতিকর্মীরাই সচেতন এবং দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষী, আজ তাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ কারণ গণবিরোধী শক্তি আজ বাংলার নির্যাতিত মানুষগুলোর শেকড়ে টান দিয়েছে। যেমন পাকিস্ড়নী ইতর শাসক গোষ্ঠী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা আপন মাতৃভাষা বাংলাকে বিলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল বেড়াল প্রথম রাতেই মারার অপচেষ্টায়। কিন্তু বাংলার তর"ণ ছাত্রসমাজ প্রতিরোধের দুর্গ সৃষ্টি করেছিলেন প্রাণের বৈভবে। জীবন বলিয়ান করতেও দ্বিধা করেননি সেদিন জননীজন্মভূমির সম্মান মর্যাদা রক্ষা করতে। তাদেরই উত্তরসূরী গণবিমুখ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় দেশের আপামর জনসাধারণের শেকড়ে হাত দিয়েছে তাকে ও ধ্বংস করার জন্যে। ওরা ভুলে গেছে সেদিনের গণঐক্যের কথা। মনে নেই বুঝি, এদেশের মানুষ বাঙালি কিংবা মগ, চাকমা, ওঁরাও, মারমা, ভীল, সাঁওতাল কত যে জাতিসত্ত্বার মানুষ একাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাষাকে বাঁচাবার জন্যে। মনে থাকে যেন, তারা কেবলই বাঙালি ছিলেন না, ছিলেন ঐ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার অগণিত মানুষও। জেল খেটেছেন জুলুম সয়েছেন অকাতরে আদিবাসী সংগ্রামী লড়াকুরা। কেবল ভাষা সংগ্রামই নয় এদেশের মানুষের সকল গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে প্রবল শক্তির আধার ছিলেন পাহাড়ে সমতলে বাস করা উপেক্ষিত জনগণও। আমাদের সংগ্রামের মাঠে ওরা আমাদের দেশপ্রেমিক সৈনিক অন্যায়ের বির"দ্ধে সংগঠিত সকল লড়াইয়ে। ওদের সকল অধিকারই আজ উপেক্ষিত। এমনকি প্রতি মুহূর্তে ওরা জীবনাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ভিটেছাড়া। জবরদখলের শিকার। ওদের ভাষা এবং সংস্কৃতিও আজ উচ্ছন্নে গেছে বৃটিশ থেকে শুর" করে আজ পর্যন্ড়ও। সেই পাকিস্ড়নী চক্রের মাতৃভাষার বির"দ্ধে চক্রান্ড়ের লড়াইয়ে এই পাহাড়ি মানুষগুলোর সে বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিল প্রবলভাবে। আজ সেই ঐক্যবদ্ধ সচেতন ১৫ কোটি মানুষের শেকড় ঐ লোকসংস্কৃতির উপর, কব্জা নয় ধ্বংস করার চক্রান্ড়ই জিয়া বিমানবন্দর চত্বরে 'অচিন পাখি' নামের শিল্পকর্মের উপর শকুনি নজর পড়েছিল কিছু পেটুয়া বাহিনীর মাদ্রাসা ছাত্র ক্যাডারদের খপ্পরে। নিরাপত্তা বাহিনীর পুলিশ আর দোয়াখায়ের ও মোনাজাতের মাধ্যমে যারা এ ভাস্কর্য স্থানটিতে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেছিল তারাই নিজেদের সিদ্ধান্ড় গিলে খেয়ে দষ্কৃতিদের আবদারে দড়ি টানাটানি প্রশয় দিয়ে ভাস্কর্যটি সরিয়ে ফেলেছে। যেখানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্ড়ির দাবিতে গোটা দেশবাসী একই কণ্ঠে সোচ্চার, তখনই এই অপকর্ম ও সরকারের প্রশ্রয় দেয়ার নির্দলীয় মহানুভতা গোটা দেশকে প্রতিটি মানুষের বুকচিরে নিয়েছে। কঠিন করাঘাত করেছে এই যা ইচ্ছে তা করে চলে যাওয়ার এই অস্থায়ী সরকার। জাতিসত্ত্বাকে অবমাননা মানুষের স্বাধীনতাকে

ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সামনে নতজানু করার কৌশল অবলম্বন করেছে। মনে রাখতে হবে সেই অপশক্তিকে এ সরকার যতই শক্তিধর হোক না কেন, একদিন তো যেতেই হবে এখন তো নির্বিঘ্নে পথে চলে যাবারই পথ খুঁজছে, এবার ওরা নিজেদের জন্যে লেভেল পেণ্ঢয়িং ফিল্ড এর অনুসন্ধানে হন্যে, উন্মাদ। ওরা চলে যাবে। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সার সাধ মিটিয়ে যারা আসবে ওদেরই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তাদের মনে রাখতে হবে– '৪৭-এ পাকিস্ড়ন আন্দোলনের জজ রায় যারা মানুষকে অন্ধ করে ফেলেছিল, '৫২তে মাতৃভাষা প্রেমী তরতাজা যুবকদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল, দেশবাসী বিশেষ করে নির্বাচকম"লী কিন্তু তাদের সহ্য করেনি। সেদিনও বিজয়ী বাংলার মানুষকে দমন করা হয়েছিল সামাজিক শাসনের শৃঙ্খলে। জাতিসত্ত্বার গৌরবে দীপ্ত বাংলার আপামর জনসাধারণ সেদিন রায় দিয়েছিল জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী।

আমারতো মনে হয় আমরা বাংলাদেশের মানুষ তেমনি এক দুর্যোগ নিপতিত। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আজ আশ্রয়ে প্রশয়ে বেড়ে উঠেছে এমনই এক মাত্রায় যে তারা মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলার মাটিতেই দাঁড়িয়ে এই বাংলার বির"দ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। গণধিকৃত পরাজিত শক্তি আজও সেই পাকিস্ড়নী দুঃশাসনের স্বপ্নে বিভোর। এদের বির"দ্ধে জনতার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সেই' ৫২। '৫৪ আর' ৬৯-এর মতন, সে রক্তিম পথযাত্রায় আমাদের দুর্জয় ঘোষণা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্ড়নী হানাদার সেনাবাহিনী এবং দোসর দালাল কসাই-জলণ্ঢাদের গণহত্যার বিপুল রক্তখরচে জন্ম নিয়েছে এই রক্তোৎপল বাংলাদেশ। আমাদের ঐক্যের অভাবে আবার সেই শকুনিই খামচে ধরেছে আমার জাতীয় পতাকা। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার সোচ্চার মুক্তি উচ্চারণ থেকে স্খলিত করে ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সহিংস হিংস্রতার ভয়াল থাবা চতুর্দিকে বিস্ড়র করছে।

আজ সেই প্রতিরোধসংগ্রামের অন্ড়র্বর্তী বাহিনী হিসেবে সংস্কৃতিকর্মীদের প্রগতিশীলতার ঝা"া নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, সমাজতন্ত্রের কথা বাংলার জনগণের কাছে আবার পৌঁছে দিতে হবে। সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার, অজেয় সম্পদ, দুর্বার হাতিয়ার। এরই সংগ্রামের মাধ্যমেই মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। আসুন সবাই এবার বলি জয় নিপীড়িত মানুষের জয়। মনে রাখতে হবে বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।

# ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন ও উদীচীর ৪০ বছর

গোলাম মোহাম্মদ ইদু

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৭ ও ৮ই নভেম্বর। পক্ষান্ড়রে গত ২৯শে নভেম্বর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উদীচীর ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। যা উদীচীর ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বছর অন্ড়র এই সম্মেলকে সামনে রেখে উদীচীর সংগঠক সারাদেশের ভাই, বোনেরা একত্র হয়ে বিগত দু বছরের কর্মকা"ের হিসেব করে, সফলতা, ব্যর্থতার বিশেণ্ডষণ করে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

এই দিনটিকে সামনে রেখে সারা দেশের ভাই-বোনেরা পরস্পর এক জায়গায় মিলিত হতে পারে। সম্মেলনকে সামনে রেখে তারা বিগত দু বছরের কর্মকা"ের হিসেব করে এবং জনগণের সান্নিধ্যে আরো বেশি করে কীভাবে আসা যায় তার জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। যেহেতু জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা তৈরি এই সংস্থা, তাই জনগণেরই কাছে জবাবদিহী করে এবং জনগণের নিকট থেকে আগামী দিনের পাথেয় সংগ্রহ করার তাগিদও উদীচীর বেশি। এই সম্মেলনকে তারা ওই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই উদযাপন করে আসছে প্রতিবার। এবার সম্মেলনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে- এবার এই সংস্থা তার জন্মের চলিণ্ডশ বছর পূর্ণ করছে। দেশের মানুষের সুখ দুখের, সংগ্রাম, শান্ড়ির ৪০টি বছর উদীচী পার করে এসেছে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এই ৪০ বছরের শুর"তে উদীচীর অবস্থা এবং আজকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে একটি বিরাট পরিবর্তন সামনে এসে দেখা দেবে। এই ৪০ বছরের শেষে এসে আজ মনে পড়ে সেই মহান ব্যক্তিটির কথা, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে এদেশের শোষিত বঞ্চিত অথচ সমাজের অপরিহার্য মেহনতি মানুষের বঞ্চনাহীন সুখী, জীবন কামনায় জীবনপাত করে গেছেন। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যম ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকা" নাটকের মাধ্যমে, আবৃত্তির মাধ্যমে, নাচের মাধ্যমে তাদের বেদনার চিত্র তুলে ধরে তাদের জাগ্রত করা যায় তার অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি কী ভাবে হচ্ছেন আমাদের সংগঠনের প্রাণ পুর"ষ মেহনতি মানুষের বন্ধু সত্যেন সেন।

এই সংস্থা গঠনের অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ৩০-এর দশকের শেষের দিক থেকেই তিনি উপলব্ধির সাথে বাস্ড়বে রূপ দিতে চেয়েছিলেন একটি গানের দলের; যে দল কৃষকদের বির"দ্ধে জমিদার-জোতদার-মহাজনের অত্যাচার-বঞ্চনা, শোষণের কথা তাদের কৃষক শ্রমিক দের সামনে, তুলে ধরে তাদেরকে সচেতন করবে। সীমাবদ্ধতার কারণে এ ব্যাপারে তখন গানকেই সহজ হাতিয়ার হিসেবে

নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তিনি শুর"টা তখন করেছিলেন কৃষক সমিতির অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের দিয়ে গান গাওয়ানোর মাধ্যমে।

লেনিনীয় তত্ত্বানুসারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের তাদের সহযোগিতা দান কৃষকদের সংগঠিত করতে মোক্ষমভাবে সাহায্য করে। ঢাকা জেলার কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে তখন সত্যেন দা শহুরে শ্রমিকদের গ্রামে কৃষক সম্মেলনে তাদের কাজে সহযোগিতা করার জন্য সমবেত করতে থাকেন। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সেই শ্রমিকদের সমবেত গণসংগীতকে সত্যেন দা শেখালেন তার লেখা গান।

ওরে ও বঞ্চিত সর্বহারা দল
শোষণের দিন হয়ে এল ক্ষীণ
নবযুগ আসে চঞ্চল।
খেটে খেটে মরলি খালি
অভাবেই দিন কাটালি
দিনে দিন সব খোয়াইলি
এমনি কপাল পোড়া
এবং
চাষি দে তোর লাল সেলাম
তোর লাল নিশানারে।

স্রেফ খালি গলায় গাওয়া। গ্রামের গায়কদের মধ্য থেকে তখন এ ধরনের গণসংগীতে অভ্যস্ড় শিল্পী পাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি কৃষক কর্মীদেরই গড়ে পিটে নিতে শুর" করেছিলেন সেই ৫০-এর দশকে।

১৯৪৮-এ মিলের শ্রমিকদের নিয়ে গঠন করেছিলেন কবিগানের একটি দল। এটি খুবই কঠিন পদক্ষেপ ছিল তাঁর। কিন্তু চেষ্টা ত্যাগ করেননি তিনি। উদীচীর গঠন প্রক্রিয়া থেকে সত্যেন দার ওই কর্মকা"কে আলাদা ভাবে দেখা যায় না। এরপরও তিনি তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করে গেছেন একটি অন্ড়তঃ গানের দল তৈরি করার, সে দল গণমুখী এবং তার লেখা কৃষক-শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা নিয়ে লেখা গান, গণতন্ত্রকামী দলগুলির সভা সমিতিতে গানের মাধ্যমে শোষণহীন বঞ্চনাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলবে। উদীচীর গৌরবের ৪০টি বছর চড়াই উৎরাই পাড় করার পূর্বে এর গঠন নিয়ে অর্থাৎ অন্ড়ত শহরে একটি গণসংগীত দল গঠন করার একটি আকাঙ্ক্ষা আমার মনেও সুপ্ত ছিল '৬০ সালে পাকিস্ড়ানের জেলে বসে আমরা ক' জন যখন গানের চর্চা করতাম তখন আমারাও ভাবতাম একটি গণসংগীত দল গঠন করার। জেল খানায় গানের চর্চাকারী দলে ছিলেন, জনাব আলি আকসাদ, পীর হাবিবুর রহমান, জনাব আলাউদ্দিন আজাদ, এবং জনাব ফয়েজ আহমদ।

ফয়েজ ভাই-ই বলেছিলেন জেলের বাইরে গিয়ে আমরা একটি গণসংগীত দল গঠন করব। আমার মনে হয় সেই প্রেরণা থেকেই সংস্কৃতি সংসদের জন্ম, যার কর্ণধার ছিলেন ফয়েজ ভাই। এবং আমার প্রেরণার উৎস গণসংগীতের একটি দল উদীচী মূর্ত হয়ে উঠেছিল সত্যেন দার ব্যক্তিত্ব এবং দীর্ঘদিনের প্রেরণাজাত গণসংগীত দল উদীচী নামে গঠিত হলো।

একসময় রণেশ দাকে পেলাম আমাদের সহযোগী হিসেবে। রণেশ দাশগুপ্তও উদীচীর সাথে সম্পৃক্ত হলেন। তখন সংগঠনগুলির সভার আগে-পিছে গান গাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। আবার সভার একেবারে শেষে একক বা সমবেতভাবে গানের একটি অনুষ্ঠানও করা হতো। ওই অনুষ্ঠানগুলোতে দেশপ্রেমমূলক নজর"ল-রবীন্দ্র বা ভারতীয় পিপলস থিয়েটারের (আইপিটিএ) কিছু গান গাওয়া হতো।

অনুষ্ঠানগুলোতে কৃষকদের উপর লেখা সত্যেন দার কিছু গান এবং আরো কিছু অজ্ঞাতনামা লেখকেরও কিছু গান আমরা গাইতাম। ওই অনুষ্ঠানগুলোতে গাওয়ার জন্য তৈরি দলের কোন নাম ছিল না বা সংগঠিত অন্য কোন দল ও ছিল না। অস্থায়ীভাবে দলবদ্ধ হয়ে গান গাইতে গাইতে আমাদের হবু গায়কদের একটা সংখ্যা দাঁড়ালো যাদের ডাকলে হাতের কাছে পাওয়া যাবে। সত্যেন দার মাথায়তো পূর্ব থেকেই চিন্ড্র ছিল একটি স্থায়ী দল গঠনের আর এটি যে অতি প্রয়োজনীয় তা সত্যেন দা বুঝতে পেরেছিলেন। তখন দেশে যে উঁচুদরের শিল্পীর অভাব ছিল তেমন নয়, যথেষ্ট নামি দামি শিল্পী ছিল যারা রেডিওতে তালুক গেড়ে বসেছিলেন। কিন্তু তারা এদিকটা সব সময় এড়িয়ে চলতেন। ধারে কাছে ঘেঁষতেন না। অনেকে এমন ছিলেন, যাদের মন চাইতো এদিকে ঘেঁষতে কিন্তু জেল জুলুমের ভয়টাই তাদের কাছে ছিল প্রবল। তারপর গণমানুষের গান করলে সরকারি রেডিওতে টিভিতে নিষিদ্ধ হবার সম্ভাবনা একশভাগ। তাই ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখে তারা দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করতেন।

সত্যেন দার ধারণাই সঠিক। তিনি বলতেন গণমুখী কাজের জন্য প্রতিশ্র"তিশীল গণমুখী মানুষ দারকার। তিনি হয়তো চাইতেন ঐ উঁচুদরের শিল্পীদের সাংগঠনিকভাবে কিছু দাঁড়া করানো যাবে না যেহেতু, তাই একেবারে নিচে থেকে শুর" করা যাক। দেশপ্রেমিক জনদরদি কিছু শিল্পীকে কখনো কখনো যে কাজে লাগানো যায়নি তা নয়। পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি শহীদ আলতাফ মাহমুদকে, অজিত রায়, শেখ লুৎফর রহমানকে।

কোন অনুষ্ঠানে যাবার প্রস্তুতি পর্বে আমাদের বসতে হতো গানের রিহার্সেলের জন্য। সেখানে সত্যেন দাও বসতেন। গান শেখানো ও পরিচালনার ভার আমারই ছিল। তবলা ছাড়াই গান রপ্ত করা হতো। অনুষ্ঠানে গাওয়ার সময়ই কেবল কোন

তবলচিকে নিয়োগ করা হতো। অনকোরা সব শিল্পী ছিল আমাদের। বিশেষভাবে নজর ুলের গান আর সত্যেনদার লেখা গান দিয়ে আমাদের শুর ু।

পুরান ঢাকার দক্ষিণ মৈসুন্ডিতে সাইদুল ইসলামের বাসায় উদীচী জন্মের আগের দিনগুলিতে আমরা দল গড়ার উদ্দেশ্যে গান সংগ্রহ করতে থাকি সবার গলায় গলায়। তবলা ছাড়া, শুধু গান। কোন আবৃত্তি, নাটক বা নাচ আমাদের ভাবনায় ছিল না।

কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমাদের অদৃশ্য বাঁধন ছিল। তখন গানের দল আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে হতো। আমরা এই দলকে মুক্তিসংগ্রামের পুরিপূরক বলে মনে করতাম। কেউ কেউ এই গান গাওয়া দলকে তেমন প্রয়োজনীয় নয় বলে ভাবতেন। তাদের কেউ এই ভাবনাতে তত্ত্ব লেপটিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না, কেউ আবার একে অপরিপক্ক বলে উপেক্ষা করতেন। পরবর্তীকালে এই উভয় মতের নেতৃবৃন্দ উদীচীর কর্মকা ে সন্তুষ্ট হয়ে উদীচীর পিঠে হাত বুলিয়েছেন, বাহবা দিয়েছেন। কেউ আবার তাকে ঘরে বসতে দিয়ে খাতির করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোজাফফর সাহেব স্নেহে আশ্রয়হীন উদীচীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তার ন্যাপ অফিসে, তোপখানায় মোনায়েম সরকার ব্যাঙাচিকে মানুষ হতে প্রভূত সাহায্য করেছেন। পীর হাবিব উদীচীকে গ্রামমুখী এবং চাষাভুসার গান করার তাগিদ দিয়েছেন। উদীচী তখন কৃষকদের জন্য অবোদ্ধ কিছু শহুরে বিপণ্ডবী গান তাদের শোনাতো যা তারা উপলব্ধি করতে পারতো না। কিন্তু গায়করা অন্ড্র দিয়েই গাইতো। উদীচীর প্রতি হেয়জ্ঞানকারীদের অনীহা এখানে নয়, এরা সবাই আমাদের অতি কাছেরই লোক ছিলেন। উদীচীকে হেয় করার মানসিকতা মনে হয় তখন সংগঠনে কোন টিভি বা রেডিও ফেস ছিল বলে। গানের দলটি ছিল আনকোরা সব ছেলে-পেলেদের নিয়ে। এরা আবার গান করবে কি! এ ছিল তাদের বোধ। শহরে গড়া দলে কোন প্রকৃত কৃষক কর্মী ছিলেন না। দূরের হলেও মনের ও আদর্শের টানে সুদূর ১০০ মাইল দূরের আদমজি থেকে তখনকার শ্রমিক খালেক ভাইয়ের সাথে ৩/৪ জন শ্রমিক আসতেন রিহার্সেলে যোগ দিতে। আসতে শুর ু করলেন নবীন খেলাঘরের তর ুণ কর্মী ও ছাত্র ইউনিয়নে যোগদানকারী কয়েকজন ছাত্র। ছাত্রী মাত্র একজন রাজিয়া (বেগম)

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনা: তখন পাকিস্ড়ানের স্বৈরাচারী শাসকদের ঔপনিবেশিক আচরণ এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মান্ধতার দাপট চরম আকার ধারণ করে দেশে। জাতিগত ভাবে যে শোষণ তারা ২১ বছর যাবৎ বাঙালিদের উপর চালিয়ে এসেছে তার হিসাব দেয়ার সময়ও ঘনিয়ে আসছিল তখন। সারা দেশের মানুষজন সচেতন হয়ে আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ড় পার্টি স্বৈরাচারের চাবুকের ঘা খেয়ে সম্বিত ফিরে পাচ্ছিল, আন্দোলনের পথ খুঁজে ফিরছিল। তখন উদীচীর গায়েও চঞ্চলতার হাওয়া লাগে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের, ছাত্র সমাজের, কৃষকেরা-শ্রমিকেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উদীচীর ডাক আসতে থাকে গান গাওয়ার। সে সময়

পুরান ঢাকার মহলণ্ডা থেকে উদীচীকে উঠে আসতে হয় উত্তর ঢাকার মালিবাগের চামেলিবাগে।

একটি গানের দলে থেকে গান করা, নাটক করা সকল শ্রমিকদের পক্ষে আনুষঙ্গিক কারণে অনেক সময় হয়ে ওঠে না। তাই হয়েছিল আদমজীরও ওই ক'জন শ্রমিক ভাইয়ের বেলায়ও। দূর ত্ব এর একটি কারণ। উত্তর ঢাকায় চলে আসার পর তাদের সাথে আমাদের দৈনিক কাজে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উদীচীর দলের সাথে শ্রমজীবীদের সেই যে বিচ্ছিন্নতা আজ ৪০ বছর পরও তা অব্যাহত আছে বলে আমার মনে হয়। নুন আনতে যাদের পান্ড় ফুরায় তারা শখের গানের দলে এসে দল রক্ষা কেমন করে করতে পারে। ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের জীবন বাঁচানোই দায়। এদের দলে নেয়া বা দলে ধরে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা আমাদেরই নেয়ার কথা। অন্য কেউ তা করবে না। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি। আমরা চলতে চলতে যেখানে গিয়ে পৌঁছেছি সেখানে থেকে তাদের নাগাল আর পাচ্ছি না যেন। চামেলিবাগেই মোনায়েম সরকারের ঠিক করে দেয়া আর পীর হাবিবের নেতৃত্বে যে মেসটিতে ন্যাপের নেতা-কর্মীরা বাস করতেন ওই ঘরটিতে ঠাঁই পাবার পর সেখানেই উদীচীর আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে।

আজকের উদীচীতে ব্যাংকারদের সংখ্যাধিক্য। ছাত্র আর ব্যাংকার, সময় অফুরন্ড়। উপরন্তু মনের জোর রয়েছে অধিক। তারাই উদীচীর আয়তন বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উদীচীর ভাই-বোনদের সংগঠিত রাখছেন। তখন চামেলিবাগের ছাত্ররা এবং পরে তাদের বন্ধু বান্ধবরা এসে উদীচীকে সমৃদ্ধ করেন। সেখানে বসেই এ সময় দলের নামের প্রশ্ন আসে। সত্যেন দা বলতেন, উদীচী নাম রাখেন। আমরা সবাই একবাক্যে অনুকূল মতামত দিয়ে দিলাম। হয়ে গেল উদীচী। পরে সত্যেন দার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হয়। তিনি বলেন, পুরান ঢাকার দক্ষিণ থেকে উত্তরে এলাম, এই উত্তর সেই উত্তর, যে উত্তরে ধ্র বতারার অবস্থান। পথ হারিয়ে যাওয়া নাবিক, মর ভূমির কাফেলা যেমন তার গন্ড়ব্য ঠিক করে নেয় ধ্র ব তারাকে দেখে, উত্তরে অবস্থিত উদীচীও দেশব্যাপী বঞ্চিত মানুষকে তার সঠিক পথটি দেখাবে। উদীচীও তাদের জন্য ধ্র বতারাস্বরূপ নিজেকে গড়ে তুলবে।

সেই চামেলিবাগেই সেদিন কিংবা অন্য যে কোন দিন হতে পারে উদীচীর একটি কমিটি হয়। কমিটিতে কে কোন পদে ছিল সেটি তখন বড় কথা ছিল না। ছিল কাজ এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানো ও উদীচীর জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা। গান গাওয়া, তা আবার সমাবেত রিহার্সেল, বাড়ির আসপাশের বাসিন্দা অনেকের কাছে এটি মনপূত হতো না। গেল কত বছর থেকে এক অবস্থাই দেখে এলাম। বিভিন্ন কারণে তখন কেউ এ ব্যাপারটিকে সহজে মেনে নিতে পারতেন না। পাকিস্ড়ানী চেতনায় লালিত তখনকার বেরসিকদের কাছে গান একটি কোলাহল স্বরূপ। গানের ধরন এবং সরকারের মারমুখো গণ বিমুখ চরিত্র নিয়ে কারো মধ্যে এব্যাপারে ভয়ও ছিল।

পুরানা ঢাকায় একবার তো প্রথম রিহার্সেলের দিনই হারমোনিয়ামে সা ধরার সাথে সাথেই বিদায় করে দেয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন দারোগা।

সবাইকে নিয়ে তখনই ঘরছেড়ে উঠে আসতে হয়। চামেলিবাগের মেসেও ছিল সমস্যা। গানের রিহার্সেলের জন্য ন্যাপের ক্লান্ড় নেতা-কর্মীদের বিশ্রামে ব্যাঘাত, দল নিয়ে বসার জায়গার অভাব ইত্যাদি সমস্যা ছিল। একটি ঘর খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টাই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

চামেলিবাগে আমাদের মেসের অদূরে মসজিদ। জামাত এবং জামাতের তখনকার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ সেখানে আড্ডা গেড়ে বসেছিল। তখন তারা পাকিস্ড়ানী স্বৈর শাসকদের ছত্রছায়ায় মারমুখো পাগলা কুকুর। যাকে পায় তাকে কামড়ায় ধরে। তারা আমাদের গানের রিহার্সেল সহ্য করতে পারে না। তারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের বির"দ্ধে প্রচারণা চালায়। শেষে লিফলেট বিলি করে। আমরা অনড় ছিলাম কিন্তু অবস্থার চাপে নিজেদের প্রয়োজনে আমাদেরকে অন্যত্র স্থান ঠিক করার জন্য চেষ্টা চালাতে হয়।

স্থানের জন্য এখানে সেখানে ঘুরতে হয়। জায়গা খুঁজে পেতে হলে টাকার দরকার, আমাদের টাকা দেবার মত কোন লোক বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। একমাত্র ব্যক্তি-চাঁদাই ভরসা। আমাদের নিজেদেরও তেমন অর্থ সংগতি ছিল না। তবু সংগঠন দীনদশায় হলেও চালাতে হবেই, সংগঠনকে বিস্তৃত করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও অর্থের সামর্থহীনতার জন্য তা সম্ভব ছিল না। কেউ রিকশায় উঠলে তার সমালোচনা করা হতো। নিজের পয়সায় গাড়িভাড়া, নৌকা, রেলভাড়া দিয়েও আমাদের অনুষ্ঠান করতে যেতে হতো। অনুষ্ঠানের জন্য আমরা কোন পারিশ্রমিক নিতাম না। সাধারণত কৃষক এবং শ্রমিকদের কোন অনুষ্ঠানে নিজেদের চাঁদা তোলা পয়সায় গাড়ি ভাড়া মেটানো হতো। অনুষ্ঠান করে পয়সা নেয়াটা কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকতো আমাদের কাছে।

এ ব্যাপারে চাপটা বেশি পড়তো সত্যেন দা, কামর"ল এবং ওয়াহিদের উপর। আর্থিক সংকটের জন্য দূরে কোথাও অনুষ্ঠান করে ফিরে আসার সময় অনেক সমস্যায় পড়তে হতো আমাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেই আমরা ধন্য হয়ে যেতাম। অনুষ্ঠান শেষে গুদাম ঘরে খড়ের উপর, স্কুলের বেঞ্চের উপর শুয়ে-বসে রাত কাটিয়ে দিতে আমাদের বোন-ভাইদের কোন দ্বিধা হয়নি। আনন্দে রাত কাটিয়ে ভোরে বাস ধরে, ট্রেনে চরে গান করতে করতে ঘরে ফিরে আসতে কোন কষ্ট হয়নি। এখন দিন বদলেছে, সবই বদলে যাচ্ছে কিছু না কিছু। ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলনে অনুষ্ঠান শেষে রাতে আমরা সবাই পায়ে হেঁটে (প্রায় ১০ মাইল) এসেছি, এখন পায়ে হেঁটে চলার ব্যাপারটি তেমন আর নেই। এখন একজনের নিমন্ত্রণের চিঠি পৌঁছতে স্কুটার ভাড়া দিতে হয়। আমরা বাসেও যেতে

পারি না। সরকারি বুক পোস্টের সুলভ সুযোগের অভাব এবং পোস্টাপিসে অনিয়মের কারণতো রয়েছেই। সত্যেন দার পয়সার অভাব তেমন ছিল না, রণেশ দারও নয়, কিন্তু তবু তাঁরা সেই পয়সা অন্যের জন্য খরচ করে নিজেরা পায়ে হাঁটতেন, রিকশায় উঠতেন না। অবশ্য এখন আমাদের কাজের ধরন বদলেছে, সংগঠনের পরিধি বেড়েছে অনেক, সংগঠন বড় হয়েছে, সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, কাজের ধরন পাল্টেছে তা ঠিক। সেই '৭১ পর্যন্ড় আমরা কোন দফতরের ব্যবস্থা করতে পারিনি। চামেলীবাগ থেকে আমরা যাযাবর হয়ে আজ এখানে কাল ওখানে করে কাটিয়েছি। গানের রিহার্সেল করতে হবে, অনুষ্ঠান করতে যেতেই হবে। আশ্রয় দিলেন শিল্পী হাশেম খানের ঘরণী, গোপীবাগে, আশ্রয় নিতে হয়েছে এ্যাডভোকেট নিজামুদ্দিনের গোপীবাগের বাসায়, সাহেদ আলির বাসায়। এ জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

উদীচীর গঠনকালীন সময় থেকে বেশ ক'বছর উদীচীকে যারা শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন যাদের জন্য উদীচী গৌরব বোধ করে। ছাত্রাবস্থায় থেকে যারা উদীচীতে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রাজনীতিক, মন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, জজকোর্টের জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত ডাক্তার, সচিব পর্যায়ের অফিসার, মহিলা নেত্রী, ডক্টরেট প্রাপ্ত আজকের মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, লেখক-লেখিকা, মুক্তিযোদ্ধা, সচেতন ব্যক্তিগণ, তাদের সংস্কৃতিমনা ঘরণীগণ এমন অনেকের নাম করা যায়।

'৬৮র পর উদীচীর অনুষ্ঠানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। এই সময়ই পাকিস্ড়ানী শাহীর শোষণ অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেশের এখানে সেখান জেল-জুলুম গ্রেফতার ভোগ করছিল পার্টির নেতা-কর্মীরা, পুলিশের গুলিগোলা চলছিল এখানে সেখানে। স্বাভাবিক আন্দোলনও দুর্বার হচ্ছিল। কিশোর মতিউর, ছাত্র নেতা আসাদ হত্যা, মায়ের কোলের ঘুমন্ড় শিশু হত্যা, বন্দি সার্জেন্ট জহুর্ল হত্যা, বঙ্গবন্ধুকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা, আগরতলা মামলা ইত্যকার অত্যাচারে বাঙালি ক্রমে ক্রমে মারমুখি হয়ে উঠেছিল। এই প্রথম তারা সমবেতভাবে হাতে লাঠি নেয়। উদীচীর গানের অনুষ্ঠানও বেড়ে যায়। ডেমরা ও আদমজীতে ঝুঁকি নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে উদীচীর কর্মীদের। তখন বেশ কিছু বোন উদীচীর কর্মকাে অংশ নিতে থাকে। তাদের আসা-যাওয়া নিয়ে সমস্যাও দেখা দিতে থাকে। বর্তমান সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখনকার বোনদের পারিবারিক খরবদারির বেষ্টনির কথা ভাবলে অত্যন্ড় কঠিন বলে মনে হবে। হাতে গোনা ক'টি মাত্র আমাদের বোন ছিল, তাদের বাইরে বার হবার সময়ও দেয়া হতো ঘন্টা হিসেবে। বেঁধে দেয়া সময়ে ঘরে ফিরতে না পারলে তাদেরকে ঘরের গি তে বেধে ফেলা হতো। পরের দিন অনুষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ। বড় ভাই হিসেবে অভিভাবকদের কাছে গেলেও সেই বন্ধনমুক্ত করা মুশকিলই ছিল। রাস্ড়ঘাটের বিপদের অবস্থা এবং সরকারি পুলিশের হামলার মধ্যে

যদি বোনেরাও পড়ে যায় তবে কে তার দায়িত্ব নেবে? এই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বোনেরা অভিভাবকদের ম্যানেজ করে রাস্ড়র গানের স্কোয়াডে দাঁড়াতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। সরকারি দালাল ও তথাকথিত ছাত্র গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য এই দিনগুলোতে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষ আক্রমণ না করলেও এই অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দলটিকে শংকিত করতে ছাড়েনি এরা। অবশ্য ককটেল বা বোমা মারার অপসংস্কৃতি তখনো তারা আয়ত্ত করেনি, কিন্তু কোমর থেকে পিস্ড়ল ফেলে দিয়ে তা আবার তুলে নিয়ে প্রদর্শন করে ভয় দেখাতে ওরা ছাড়তোনা। তারপরেও বোনেরা ঘরে বসে থাকেনি কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। শহরে একুশের অনুষ্ঠান, মে দিবস, লেনিন জন্ম দিবস, অক্টোবর বিপণ্ব দিবস, বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির অনুষ্ঠান, ছাত্র ইউনিয়ন, ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদিতে আমাদের ডাক পড়লে যেতে হতো।

আমাদের অফিস বা ঘর ছিল না, এভাবে বহুদিন কেটে যায়। এলো ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তখন শহরে থাকাই দায়। আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম ২৫ মার্চের গণহত্যার ধকলে। পাকিস্ড়নি হানাদার বাহিনীর একতরফা এবং আকস্মিক হামলায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমাদের গানের মুখ তখন বোবা হয়ে যায়। কয়েক দিন পরই আমরা সম্বিত ফিরে পাই এবং নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে নেই।

বাঙালির অস্ড়িত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল বিদেশী ওই পাকিস্ড়নীরা। নিজেদের গোষ্ঠীশাসন অব্যাহত রাখার জন্য তারা মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলো ধর্মকে। নেচে উঠলো ধর্ম ব্যবসায়ীরা। বাঙালি জাতির বির"দ্ধে সাঁড়াসি আক্রমণ চালালো তারা ও তাদের প্রভু মিলিটারিরা। অপ্রস্তুত আমরা, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম পরস্পর থেকে। শহড় ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অজানা অচেনা পথে আমরা সবাই ছিটকে পড়লাম। বিচ্ছিন্নভাবে থেকেও আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে নিলাম- র"খে দাঁড়াতে হবে এই অত্যাচারীদের। হারমোনিয়াম-তবলা ছেড়ে আমাদের কয়েকজন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেমে পড়লো। কেউ প্রতিরোধ সংগ্রামে সংগঠক হিসেবে কাজ করতে লাগলো।

শহরে থাকা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না কেউ মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহে গ্রামে কাজ করছে, কেউ প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যাওয়া বন্ধুদের পথ দেখানোর কাজে অংশ নেয়। কেউ প্রত্যক্ষভাবে বন্দুক কাঁধে যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধের ক্যাম্পে তারা সমবেত গানও গাইতো, আবার যুদ্ধেও যেত হানাদার নিধনে। উদীচীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সেন্টু রায়, সহ-সভাপতি মোফাখখার"ল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ সেলিম, সম্পাদক মন্ডলীর প্রাক্তন সদস্য রঞ্জু সরকার যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ মাতৃকার রক্ষায় কিছুটা হলেও অবদান রেখেছে।

সত্যেন দাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হলো ওপারে। আমাকে মিলিটারিরা নাম ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর চলে যেতে হলো শ্রীনগর। নয়টি মাস অতিকষ্টে অতিবাহিত হবার পর লক্ষ লক্ষ জীবনের বলিদানের পর দেশ স্বাধীন হলো, বন্ধুরা রাইফেল কাঁধে শহরে ফিরলো বিজয়ী বেশে। বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস বিল্ডিং মাঠে, পরে শহীদ মিনারে তাদের জমায়েত হলো। যুদ্ধের পর আবার উদীচী সংগঠিত হলো। আবার গানের মহড়া শুর হলো এবাড়ি ওবাড়িতে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্ড়নি কারাগারে থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন দেশের কর্ণধার হয়ে নিজের হাতে দেশ গড়ার ভার নিলেন।

একটি ঘর পাবার আশায় সত্যেন দা গেলেন বঙ্গবন্ধুর নিকট। বঙ্গবন্ধু তাকে দেখে উঠে এসে হাত ধরে পাশে বসালেন। বললেন, কষ্ট করে আপনি কেন এলেন, আমাকে খবর দিলেই তো হতো। বঙ্গবন্ধু বলে দিলেন, ঘর পাবেন। এরপর আমরা একে একে কয়েকটি বাড়ি পেলাম আর সরকারের প্রয়োজনে ছাড়লাম। শেষে আমাদেরকে তোপখানা রোডের অফিসটিতে জায়গা নিতে হলো। এখানেই উদীচী জনগণকে দেয়া তার প্রতিশ্র তি পালনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭২ সালের পর থেকে উদীচী স্বয়ং দেশব্যাপী এক দুর্বার আন্দোলন হিসেবে দেখা দেয়। অসংখ্য শাখা সংগঠনের জন্ম হতে থাকে দেশের আনাচে কানাচে। কেন্দ্রীয় সংগঠনে এসে যোগদান করতে থাকেন দেশের প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বাংলা সাহিত্যের নিবেদিত প্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মীগণ।

স্বাধীন বাংলাদেশে তার বাঙালি সন্ড়ানেরা দেশ গঠন তথা বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য পুনর দ্ধার কর্মকা ে শামিল হতে থাকে। সারা দেশে পাকিস্ড়ানের কারগার হঠাৎ যেন মুক্ত হয়ে যায়। উদীচীতে প্রাণের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। উদীচীর কর্মচাঞ্চল্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলার কর্মকা চলতে থাকে। শাখা গড়ে উঠে চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিলণ্ডা, বরিশাল, যশোরে, ময়মনসিংহে। তখন জেলা, উপজেলা, থানা এভাবে বিভাগীয় সংগঠন ছিল না। শাখাগুলি গড়ে উঠেছিল সুযোগ ও সুবিধার ভিত্তিতে। বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে না হয়ে শাখা গড়ে উঠলো কোন এক থানায়, হয়তো থানার মাধ্যমে জেলা সদরে শাখা গড়ে উঠলো। এভাবে কয়েকটি বছর অতিবাহিত হবার পর সুষ্ঠু কেন্দ্রাতিকভাবে শাখাগুলো গড়ে উঠলো। কেন্দ্র ঢাকাকে ভিত্তি করে এপর্যন্ড় দেশব্যাপী বহু সাংগঠনিক জেলা সংসদ তাদের কর্মকা চালাচ্ছে। এই জেলায় অন্ড়র্ভুক্ত থানা এবং এলাকায় সক্রিয় এবং আধা সক্রিয় ২১০টি শাখা রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০০। বিদেশে উদীচীর ৫টি শাখা কাজ করছে।

১৯৭২-এর আগে উদীচী কেবল ১টি গণসংগীতের স্কোয়াড নিয়েই গর্ব করতো, সাংস্কৃতিক অন্যান্য বিভাগের কথা চিন্ড়াও করতে পারতোনা। এখন এর ৭/৮টি

বিভাগ কাজ করছে। যথা সংগীত, নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, চারুকলা, পাঠাগার ও সাহিত্য ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো সারা দেশের উদীচী কর্মকাণ্ড রাজধানী ঢাকা থেকে পরিচালিত হচ্ছে, দৃশ্যত তাই দেখতে পাই। কিন্তু কেন্দ্রের নাগালের বাইরে গিয়েও কোন কোন শাখা এমন কতগুলো কাজ করে যাচ্ছে যা অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রের করার ছিল, কেন্দ্রের পক্ষে যা সহজ নয় সেরকম কতগুলো কাজ ঐ শাখাগুলো করে যাচ্ছে। সংগঠনকে সমৃদ্ধ করছে। সংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আবৃত্তি বিভাগ, নাটক বিভাগ, নৃত্য বিভাগ, সংগীত বিদ্যালয়, পাঠাগার, চারুকলা বিভাগ, সাহিত্য বিভাগ ও শিশু বিদ্যানিকেতন। শাখাগুলোর সংগীত বিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম ধারণ করে বিরাজ করছে। যেমন, সত্যেন সেন বিদ্যানিকেতন, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, আলোকময় নাহা, কমল গুণ, মুন্সি রইসউদ্দিন প্রমুখের নাম জড়িয়ে তাদের স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

প্রতিটি শাখায়ই গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন উপলক্ষে তারা সমবেত বা একক গান করে থাকে। গানের ধরনের মধ্যে রয়েছে, গণ সংগীত, বিভিন্ন লোক সংগীত, রবীন্দ্র, নজরুল, ডিএল রায়, সুকান্ত, হেমাঙ্গ, রজনীকান্ত, লালন, হাসন রাজা, বাংলার নাম না জানা অনেকের গান, সত্যেন সেনের গান, বিভিন্ন শাখায় উদীচীর আত্মার আত্মীয় লেখকদের গান, উদীচীর অনেক ভাই-বোনের লেখা গান গেয়ে থাকে উদীচী। উদীচী গেয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের গান, শ্রমিক কৃষকের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শোষকের বিরুদ্ধে, কূপমন্ডূকতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, দেশের গান, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গান।

দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে মৌলবাদীদের আস্ফালনে এখন মোটামুটি বন্ধ্যাত্বই চলছে বলে মনে হয়। মৌলবাদীদের বোমার ভয়ে দেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি সংকুচিত হয়ে পড়েছে দৃশ্যত। আগের মত আর প্রাণবন্ত নয় তারা। মৌলবাদীরা তাদের হত্যাযজ্ঞটি শুরু করেছিল উদীচীরই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ১০ জন দর্শক-কর্মীকে হত্যার মাধ্যমে যশোরে। তাদের গোপন হত্যাযজ্ঞ তারা প্রায় ১০টি বছর ধরে নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতে পেরেছিল। আজ পরিষ্কার হচ্ছে এসব হত্যাযজ্ঞে বিগত সরকারের কিছু কূপমন্ডূক ব্যক্তির সহযোগিতার কথা। যশোরের পর পরই ছায়ানটের বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখের রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা। সেখানে ৭টি তাজা প্রাণের বলি হয়। এর জের ধরে পল্টনে সিপিবি'র জনসভা, ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের কর্মীসভা, নেত্রকোনায় উদীচীর দফতরে বোমা হামলা, গির্জায়, ওরসে, যাত্রা পালায়, নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা হামলা, পরবর্তীকালে দেশের রাস্তা ঘাটে, বিচারালয়ে বোমা হামলা, শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে বোমা হামলা,

সিলেটে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা কিবরিয়া হত্যা– এ ধরনের বহু হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তারা। এসব হত্যার বিচার এখনো হয়নি।

সারা দুনিয়ার দেশে দেশে সে দেশের মানুষ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করবে, গৌরব করবে, এতো দেশপ্রেমের কথা। দেশপ্রেম কার না থাকতে হয়। এ ব্যাপারে যারা বাধা দিতে আসে তারাই শেষ হয়ে যায়, দেশের সংস্কৃতিই অব্যাহত থেকে যায়। দেশের আপামর জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণেরই দেয়া সংস্কৃতি চেতনা উদীচী অব্যাহত ভাবে ধারণ করে যাবে এবং শোষণ বঞ্চনাহীন একটি সুন্দর সমাজ গঠনে কাজ করে যাবে। এখানে আজীবন বিনয়ী সংগ্রামী মেহনতি মানুষের বন্ধু, উদীচীর মানসপুত্র সত্যেন সেনের গানের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি:

মানুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী
তাই দিয়ে রচি গান,
মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাবো
মানুষের দেয়া প্রাণ।

*সভাপতি, উদীচী*

*এখানে আশা জাগে যে রনেশ দা'র সেই পরামর্শের কথা। তিনি বলেছিলেন, দেশের আনাচে-কানাচে আমাদের দেশের মাটির গন্ধে মিশে থাকা এবং আঞ্চলিক ভাবে গড়ে ওঠা গান, পালা ইত্যাদি যুগযুগ ধরে যা চলে আসছিল অথচ এখন, হারিয়ে বসে আছে। তা উদ্ধার করে সে গুলোকে উদীচী দেশের মানুষের সামনে নিয়ে আসবে। আবার সেগুলোকে পুনরুজ্জীবীত করে নেবে।

# বিপণ্ঢবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উদীচী

মনজুর"ল আহসান খান

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতহাসে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গগণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধিকার সংগ্রাম একধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির উপর দমন নির্যাতন চালাবার সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার বাহকরা রাজনীতি সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। একই সাথে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্ড়ানের মূল ভূ-খ" বা অপর অংশ থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা, অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা শ্রেণীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পাকিস্ড়ানের কৃত্রিমতাকে। শাসক শ্রেণীর দমন নীতি বেশিদিন গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট পাকিস্ড়ানের বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার বাংলাদেশে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও মধ্যস্ড়রের জনগণের জীবনে যে সর্বগ্রাসী সংকট সৃষ্টি করেছিল তার বির"দ্ধে সমাজের সর্বস্ড়রের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে থাকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেফতার ইত্যাদির ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সাময়িকভাবে স্ড়িমিত হয়ে এলেও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি মানুষের আন্দোলন রাজনীতিতে স্থবিরতা কাটাতে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'৬৫ এর যুদ্ধের সময় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক উগ্র পাকিস্ড়ানি জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বঞ্চনার বির"দ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যিক চিন্ড়াবিদ ও সংস্কৃতি কর্মীরা বিশাল ভূমিকা পালন করেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আত্মগোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ, ছায়ানট, রবীন্দ্র-নজর"ল-সুকান্ড় জয়ন্ড়ী থেকে শুর" করে নানা সংগঠন সমিতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও চেতনা শক্তিশালী হতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীতে প্রগতিশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন রচনায় এই সাংস্কৃতিক ও মানবিক চেতনার পটভূমি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক চিন্ড্র চেতনা বিকাশের পাশাপাশি সমাজপ্রগতির চিন্ড্র চেতনাও ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। বস্তুত কমিউনিস্ট প্রগতিশীল ও বাম মনোভাবাপন্ন শক্তিই সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে। রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করা ও নজর"লকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা, পাকিস্ড়ানি মতাদর্শের বির"দ্ধে প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক চেতনার পক্ষে সবচেয়ে দৃঢ়, আপোষহীন ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রাম পাকিস্ড়ানের শাসকগোষ্ঠীর বির"দ্ধে পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্ড়ানের দ্বি-জাতি তত্ত্ব পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। বাস্ড়ব কারণেই ওই জাতীয় সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্ড়র থেকে অগত বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এ সব উপাদানের প্রভাব এক মাত্রায় ছিল না। এমনকি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চেতনার ক্ষেত্রেও ছিল নানা দুর্বলতা। পরবর্তীতে এইসব দুর্বলতা ও স্খলনের সুযোগ নিয়েছে সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠী।

কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তি ও তার প্রগতিশীল উপাদানকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য নানা ভাবে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী সাহিত্যিক চিন্ড্রবিদ ও সংস্কৃতি কর্মী সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খুব ভালোভাবেই জানতেন সাম্প্রদায়িকতা, পুঁজিবাদ ও সামাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি এবং বিপণ্চবী বুদ্ধিজীবী। ৬০-এর দশকে শেষ দিকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক ও মেহনতি মানুষের যে সব আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে সেগুলোর সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র বা রাজনৈতিক সম্মেলনে গণসংহতি নাটক অনুষ্ঠানের তাগাদা বাড়তে থাকে। আমি নিজে তখন আত্মগোপন অবস্থায় কর্মরত কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হিসেবে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত। শ্রমিকদের বিভিন্ন সভায় গান নাটক অনষ্ঠানের জন্য শ্রমিকদের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে শিল্পী নিয়ে আসি। ২১ শের প্রভাতফেরীতে শ্রমিকদের গানের দল করা হয়।

সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিক ফেডারেশনের প্রভাতফেরী সবচেয়ে শক্তিশালী গানের মিছিলের সামনে ঠ্যালাগাড়িতে করে দেশাত্মবোধক ও গণসংগীত পরিবেশন করতে। প্রেস শ্রমিকনেতা সাইদুর রহমান এ সব গানে নেতৃত্ব দিতেন। এ সময় সত্যেন দা সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন সভা সমাবেশে যাচ্ছেন। আন্দোলন সংগ্রামের জন্য নিজেই গান রচনা করছেন, সুরও দিচ্ছেন। আমার সাথেও মাঝে মাঝে শ্রমিক এলাকায় যাচ্ছেন। শ্রমিকদের সাথে কথা বলছেন। তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনছেন।

সে সময় ঢাকার শান্ড়িনগরের চামেলীবাগে তর"ণ কিশোররা বেশ সংগঠিত। পাড়ায় ক্লাব, রবীন্দ্র-নজর"ল জয়ন্ড়ী, একুশের অনুষ্ঠানে তৎপর। আমাদের ৩২/১ চামেলীবাগের বাসায় প্রায়ই গানের, আবৃত্তির জলসা হতো। সত্যেন দা প্রায়ই আসতেন। এই সময় সত্যেন দা 'ইন্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ থিয়াট্রিকাল এসোসিয়েশন', আইসিটিএ' ধাচের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সাথে আলাপ করেন।

কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, এক পর্যায়ে সাইদুর রহমান ভাইয়ের বাসায় সত্যেন দার উদ্যোগে আমরা একত্রিত হই। গোলাম মোহাম্মদ ইদু, চামেলীবাগের ছেলে মেয়েরা আমার ছোট ভাই বদর"ল আহসান খান, কামর"ল আহসান খান, মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সাংবাদিক ইয়াকুব ভাই, তার বোন প্রয়াত রিজিয়াসহ এমন অনেকেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। এর পর কখনও আমাদের চামেলীবাগের বাসায়, কখনো আমিনবাগ মসজিদের পাশে অ্যাড. আনোয়ার চৌধুরীর বাড়ি সংলগ্ন ন্যাপের মেস বা মোর্শেদ আলীর মেস বলে খ্যাত ঘরটিতে রিহার্সেল চলতে থাকে।

এক পর্যায়ে ৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর উদীচীর জন্ম হয়। সত্যেন দার নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠনে প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন কামর"ল আহসান খান, এর পর চামেলীবাগেরই মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান ও ইকরাম আহমেদ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

উদীচী গঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। দেশে অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। সেগুলোর তৎপরতার সাথেও গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি জড়িত ছিল। পৃথকভাবে উদীচী করার কেন প্রয়োজন হলো। উদীচী কোনো মৌখিক সাংস্কৃতিক দল নয়। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের গন্ডির মধ্যেও উদীচী নিজেকে আবদ্ধ রাখে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতিটি প্রগতিশীল উপাদানকে ধারণ করে উদীচী তার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়। সাম্প্রদায়িকতা, পাকিস্ড়ানি দ্বি-জাতি তত্ত্ব, জঙ্গিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বির"দ্ধে সমাজতন্ত্র তথা মানবমুক্তির সংগ্রাম ও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে নেয়ার জন্যই সেদিন উদীচীর জন্ম হয়েছিল। শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের সাথে যুক্ত হয়েই উদীচীর অভিযাত্রা। বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামে উদীচী যেমন সামনের সারিতে ছিল তেমনি দেশের শোষিত মেহনতি মানুষের শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষায় ছিল সোচ্চার। বিশিষ্ট মার্কসবাদী সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত উদীচী সংগ্রামের জাতীয় এবং শ্রেণীগত দিক বিস্মৃত হয়নি বরং তাকে সমন্বিত করে অগ্রসর হয়েছে।

লেনিন বলেছিলেন 'সবকিছু নৈতিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্র"তির পেছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থ আবিষ্কার করতে না শেখা

পর্যন্ড় লোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ বলি হয়ে ছিল এবং থাকবে।' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কিন্তু কখনও সংকীর্ণতা বা নিহিলিজমের কোনো স্থান নেই। লেনিনই আর এক জায়গায় বলেছেন, 'বিপণ্ঢবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই জন্য যে মার্কস কখনও বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি বরং উল্টো মানব চিন্ড়া ও সংস্কৃতির দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান ছিল তাকে আশস্ড় করেছে ও ঢেলে সেজেছে।' এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে উদীচী অগ্রসর হয়েছিল বলেই আমরা দেখতে পাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্ড়িক ঘটনার পর অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন তেমন কিছু করতে না পারলেও উদীচী 'ইতিহাস কথা কও' এর মধ্যে দিয়ে গর্জে উঠেছিল। আবার পঞ্চদশ সম্মেলন আওয়াজ তুলেছিল 'বিশ্বগ্রাসী দানবকে বিশ্বমানব দাঁড়াও র"খে'।

আজ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠী আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিমূলে আঘাত হানছে। একদিকে ধর্মান্ধতা অপরদিকে ভোগবাদী সংস্কৃতি আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের আস্ফালন, গ্রেফতারি পরওয়ানা মাথায় নিয়ে যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতার সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৈঠক, বাউল ভাস্কর্য অপসারণ, শিখা অনির্বাণসহ অন্যান্য ভাস্কর্য অপসারণের হুমকি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা ছাত্রদের তা"ব এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক লুটেরা ধনিক শ্রেণী ক্ষমতার লোভে যে কোনো অপশক্তির সাথে সমঝোতা ও ঐক্য করতে প্রস্তুত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বব্যাপী লুণ্ঠন ও আধিপত্য নিশ্চিত করতে সমাজের নিকৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা লুটেরা ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ আজ এক সূত্রে বাধা। এদের বির"দ্ধে আপোসহীন লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে পরাভূত করতে হলে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, 'বিপণ্ঢব শুর" হয় সংস্কৃতি থেকে।' আমাদের মুক্তিযুদ্ধও শুর" হয়েছিল ভাষা সংগ্রামকে ঘিরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। উদীচী পারে সেই বিপণ্ঢবী সাংস্কৃতিক আন্দেলনকে এগিয়ে নিতে।

*সভাপতি, সিপিবি*

# বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

হাসান আজিজুল হক

সমাজে ধন-বিত্ত-সম্পদের ভারসাম্যহীনতাই মূল কথা। অল্প-স্বল্প ভারসাম্যহীনতার কথা বলা হচ্ছে না। তা সব সমাজেই আছে। ক্ষমতা-বুদ্ধি কর্মনৈপুণ্য তো আর জনে জনে সমাজে ভাগ করে দেয়া যায় না। কম-বেশি থাকবেই। ব্যক্তির বৈচিত্র্য বাধাহীন করাই তো মানুষের সমাজের কাজ। এ ধরনের বৈচিত্র্য, পার্থক্য, বহুত্বকে মোটেই ভারসাম্যহীনতা বলা হচ্ছে না। আমার বলার কথা খুব নির্দিষ্ট। ধন-সম্পদের নিদারুণ ভারসাম্যহীনতা। পালণ্ডার একদিকে এক কেজি অন্যদিকে পৌনে এক কেজির কথা নয়। কথা হচ্ছে, একদিকে এক হাজার গ্রাম, অন্যদিকে পাঁচ গ্রাম। এরকম হলেই পুরো সমাজ ঠুঁটো অকর্মণ্য হয়ে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে। ধনের ভারসাম্যহীনতা তখন বিদ্যার ভারসাম্যহীনতাকে ডেকে আনে। তৈরি হয়ে যায় প্রায় গাণিতিক নিয়মে, বিদ্যার ভারসাম্যহীনতা, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, নেতৃত্বের ভারসাম্যহীনতা। তখন মানুষ, সিংহভাগ মানুষ, গর্তে বাস করতে থাকে। তারপর এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যায় যখন এদের আর মানুষ বলা যায় না। ওই অভিধাটাই তারা খুঁইয়ে বসে। এ কথাগুলো বলার জন্য কাউকে কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট বলার দরকার পড়ে না। সমাজতান্ত্রিক বলে গাল দেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। ধনে-সম্পদে ভারসাম্যহীনতা কি করে তৈরি হয়, কবে থেকে তৈরি হয়েছে, কে দায়ী, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগ্যতার কি তারতম্য নেই, যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়ে গেছে তা মন্ত্রবলে বদলে ফেলে কি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা সম্ভব – এরকম অজস্র প্রশ্ন তোলা সম্ভব বটে, তাতে মূল কথাটা কিন্তু মিথ্যে ও অবাস্তব প্রমাণিত হয় না।

যাই হোক, ভারসাম্যহীনতা যখন প্রবল তখন সমাজের সমস্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিত আলাদা হয়ে যায়। আর সমাজে যদি চলনসই ভারসাম্য বজায় থাকে তাহলে সমস্যাগুলো দেখা দেয় একেবারেই ভিন্ন চেহারায়। এই ব্যাপারটা খেয়াল না থাকার ফলে সমাজ নিয়ে আমরা প্রচুর বাজে বকি। কিংবা যেটা আমার বা আমার মতো যারা তাদের সমস্যা, সেটাকেই আমরা প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে রায় দিয়ে দিই। দরকার পড়লে নানারকম তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে চাই, আমার সমস্যার সঙ্গে সব সমাজের সমস্যা যুক্ত। কারণ কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

যে সমাজে মোটামুটি বৈষয়িক ভারসাম্য আছে – নানারকম আপত্তি থাকলেও বলতে পারি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোসহ পৃথিবীর 'এ' মার্কা দেশগুলো খুবই বড় আকারের একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর তুলনামূলকভাবে ছোট একটি ধনিক ও একটি

গরিব শ্রেণী গড়ে তুলে এক ধরনের রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, যার প্রায় সব সমস্যাই গোটা দেশের জনগণকে সম্বোধন করতে পারে। এরকম দেশের গণতন্ত্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, জনগণের আয়-ব্যয়ের সমস্যা, রাষ্ট্রের আয়-উপার্জনের সমস্যা, বলতে গেলে কোনো সমস্যাই স্রেফ গণতন্ত্র বহাল আছে বলেই, আমাদের দেশের সমস্যার সঙ্গে মোটেই এক নয়।

বিষম বাংলাদেশের বিষম সমস্যা। কারও সঙ্গে মিলবে না। বৈশ্বিক হওয়ার লোভে আমরা মেলাতে চাই বটে। আচ্ছা, আমাদের দেশে শিক্ষার গুণাগুণের প্রশ্নে কে আগ্রহী হতে পারে? তার আগে জেনে নিন এ দেশে আশি ভাগ লোকের সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। কেন নেই, সে আলাদা প্রশ্ন, 'নেই' এইটাই হচ্ছে কথা। দেশের কতভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা নিতে আসে, পাঁচ বছরের মধ্যে কতভাগ শিশু ঝরে যায়, কতভাগ টিকে থাকে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক আর শেষ পর্যন্ড় উচ্চ শিক্ষার কতভাগ টেকে তার পরিসংখ্যান নিলেই বুঝতে দেরি হবে না, শিক্ষার যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা ভাবি সেগুলো সবই ফালতু। ফালতু এজন্য যে ধনে-বিত্তে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা সমাজের আশিভাগ মানুষকেই ফালতু বানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে এখানে মানবাধিকারের কথাটা বাজে কথা, ভোটাধিকারের কথাটা বাজে কথা, নির্বাচন বা জনগণের কথাটা বাজে কথা। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস', এখনকার পরিস্থিতিতে, এই কথাটা সবচেয়ে নোংরা কথা – ভদ্র সমাজে যাকে বলে অশণ্টীল-অশিষ্ট কথা। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতটা বদলে নিলেই দেখা যাবে এই কথাগুলো প্রকৃত অর্থেই, অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে, স্বল্পসংখ্যক ধনপতির কাছে, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কাছে।

এবার ভেবে দেখি না কেন, এদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে দেশ কি? সমাজ কি? বাংলাদেশ কি? বাঙালি সংস্কৃতি কেমন? এসব বিতর্ক কি কোনো অর্থ বহন করে, যখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের পুরো রাজনীতি মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ? তবে মধ্যবিত্তের স্বার্থে নয় কিন্তু। আওয়ামী লীগ বলি বিএনপি বলি ইস্যুর ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যাবে তাদের বেশিরভাগ ইস্যু মানুষকে স্পর্শ করছে না। যেসব প্রসঙ্গ সবাইকে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে সেগুলোর মধ্যে কেউ যাচ্ছে না এবং এ জায়গাতে সবার মধ্যে চমৎকার একটা ঐক্যমত্য আছে। সবকিছুই হচ্ছে বর্তমান অবস্থাটা টিকিয়ে রাখার জন্য, এ অবস্থাটা ভেঙে নতুন কিছু একটা গড়ে তোলার ব্যাপারে কেউ রাজি নয়।

এখন নতুন প্রজন্ম বলে যাদের আমরা চিহ্নিত করছি তারা মোটামুটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গেই যুক্ত। এর নিচে কৃষকের যে ছেলেটি তর"ণ হচ্ছে তাকে আমরা তর"ণ প্রজন্মের মধ্যে আদৌ জায়গা করে দিচ্ছি কি না, তা ভেবে দেখার

বিষয়। আমার ধারণা, আমাদের দেশের তির-চার কোটি মতো যুবক এসেছে একেবারে কৃষকসমাজ থেকে। তর"ণ প্রজন্ম কি করবে, তা নিয়ে কথা বলার সময় ওই তিন-চার কোটি যুবক আমাদের ভাবনার মধ্যে থাকছে না। অর্থাৎ পুরো রাজনীতি, পুরো অর্থনীতি, সমাজের সবকিছু গ্রাস করে এর বাইরে তাদের রেখে দেয়ার আয়োজন আজ আমরা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। আমি যখন তর"ণ প্রজন্মের কথা বলছি, তখন মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বলয়ের মধ্যে যারা আছে শেষ পর্যন্ড় তাদের কথাই ধরছি।

এটা ঠিক কথা যে, তিন-চার কোটি যুবক আমাদের গণনার মধ্যে নেই। ওরা মূক জনতা, মূকই থেকে যাচ্ছে, কখনও কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই ওরা আসছে না। তাই বলে কি আমরা বলব যে, শিক্ষিত বলয়ের মধ্যে সবাই যেহেতু মধ্যবিত্ত তাদের নিয়ে কোনো চিন্ড়াই আমরা করব না? একজন কট্টর বামপন্থী বলতে পারেন, তাদের নিয়ে ভেবে লাভ কি? পুরো সমাজকে সঙ্গে নিতে না পারলে কিছুই ভাবার দরকার নেই। এই সমালোচনাটা তারা ঠিকই করছেন, যাদের আমরা মূক-বধির বলছি তাদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সত্যিই ঘটবে না। ওই অবস্থা থেকে তারা উঠে আসবে এ রকম কোনো রাস্ড়ার বুদ্ধিজীবী বা অর্থনীতিবিদ কেউ এখনো দেখাতে পারেননি। আপাতত রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা অচ্ছুৎ, কোথাও তারা ঢুকতে পারছে না, দরজাটাই যে তাদের জন্য বন্ধ। কেবল শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই একটু ভালো করে বিচার করলে বোঝা যায় যে, তাদের পক্ষে কোথাও ঢোকা একেবারেই অসম্ভব। এ সমাজে এলিট শ্রেণী তৈরি হতে বাধ্য। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা বিদেশ গিয়ে লেখাপড়া করা – খুব ছোট্ট একটা এলিট ক্লাসের মধ্যে সীমিত রয়েছে। এর বাইরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটা একরকম ভেঙেই পড়েছে। আমাদের অর্থনীতি এভাবেই বিন্যস্ড়, এভাবেই বিন্যস্ড় আমাদের সমাজব্যবস্থা, আমাদের রাজনীতি। কাম্য হোক বা না হোক, অবস্থাটা তাই।

এখন কিছু করতে হলে ভাঙতেই হবে। কর্তব্যও ভাবতে হবে সেই সঙ্গে। সবার জন্য কি আমরা সমান করে দেব শিক্ষাটা, লুপ্ত করে দেব কম-বেশির ব্যাপারটা? কোনো সরকারের পক্ষেই আসলে এটা করা সম্ভব নয়। এই যে এ-লেভেল, ও-লেভেল চালু হয়েছে, সেগুলো ভেঙে দিয়ে সবার জন্য একটিমাত্র শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতে পারা এবং সেটা করতে পারা বর্তমান বিন্যাসের মধ্যে সম্ভবই নয়। কাজেই স্থিতাবস্থা রাখতেই হবে।

আবার এ কথা তো ঠিক যে, পরিবর্তনটা প্রথমে আসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মধ্যে। প্রগতির বীজ এখানেই থাকে। কাজেই বড় কিছু ঘটাতে হলে এখানে কিছু ঘটাতে হবে। প্রক্রিয়া যদি কোনো একটা জায়গা থেকে শুর" না করি, তাহলে কখনোই তা আর করা হবে না। একটা ইঞ্জিন শ্রেণী দরকার। কম্পার্টমেন্টগুলোকে টানার জন্য

দরকার। একটা ইঞ্জিন। সমাজেরই তো একটা ইঞ্জিন বা চালক শ্রেণী দরকার, ইতিহাসের চালক। মার্কস এ বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কথাই বলেছেন। আমি বলব, এটাকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপার আছে। কট্টর মার্কসবাদী বলতে পারেন, শ্রেণীচেতনা মানুষের মৌল প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যশ্রেণীভুক্ত একজন মানুষ কোনক্রমেই শ্রেণীবিচ্যুত হতে পারে না। এসব বিষয় নিয়ে বহু তর্কাতর্কি হয়েছে কিন্তু কথা হলো, শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলার জন্য যে কাউকে আবশ্যিকভাবেই শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসতে হবে, ইতিহাসের দৃষ্টান্ড় তেমন নয়। লেনিন একটা দৃষ্টান্ড়। এক অর্থে সব বিপণ্ঢবী নেতাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলেছেন, এসেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। তাতে সবকিছু উচ্ছন্ন বা চুলোয় গেছে বলে বলা যাবে না। ইতিহাসে বহুবার তা ঘটেছে।

মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত তর"ণ সম্প্রদায়ের ওপর ভবিষ্যতের জন্য আস্থা রেখেই জানাতে ইচ্ছা করে, তারা এখন কি ভাবছে। তবে একটা প্রশ্ন নিজেকে করতেই হবে; তর"ণ প্রজন্ম যে চোখেই আজকের বিশ্বকে দেখুক, সেই বিশ্বের কাছে তাকে কি দাসানুদাসের আনুগত্য নিয়ে র"টি ছুড়ে দেয়া ভিখারির মতো যেতে হচ্ছে না? তারা কি এই কসমোপলিটানিজমের আদলে পুঁজিবাদই চায়? কিন্তু তাতেই কি খুব সুবিধা? টাকা কেউ কাদা থেকে তুলুক কি মানুষের বিষ্ঠা থেকেই তুলুক দাম তার একই থেকে যায়। তাই যদি হয় তাহলে পুঁজির ব্যাপারে ধর্ম দেশ কাল, জাতীয়তাবাদ, কোনোটারই কোনো মূল্য নেই। বিশ্বায়নে পুঁজিবাদেরই পোয়াবারো। আজকের তর"ণ যদি বলে আমি বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না, কোনো সংস্কৃতিই ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর দায় আমার নেই। আমি এ সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার সামনে আছে সব পৃথিবী। এই মনোভাব পুঁজিবাদী বিশ্বের কোনো অসুবিধা হবে না, পুঁজিবাদী বিশ্বের জন্য বরং সেটাই সুবিধাজনক। নিজে সাম্প্রদায়িক না হলেও সে সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহার করবে। তার কারণ তার কাছে মূল জিনিস হচ্ছে মুনাফা, আর তার শোষণের মূল ক্ষেত্রটা হচ্ছে শ্রম। সে যখন শোষণ করছে তখন এই শ্রমটারও কোনো চরিত্র তার কাছে নেই, তা সে শ্রম হাড়ি দিক, বাগদি দিক, হিন্দু দিক আর মুসলমানই দিক। শ্রম বিক্রি হয়। কাজেই কারখানায় যে লোক নিয়োগ করে সে প্রয়োজন না হলে সাম্প্রদায়িকতা উস্কায় না। কেননা হিন্দু শ্রমিক আর মুসলমান শ্রমিকে পার্থক্য করার কোনো দরকার তার নেই। আবার রাজনীতির জন্য প্রয়োজন হলে তার মতো বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকও আর কেউ নয়।

এ রকম একটা কসমোপলিটন পৃথিবীতে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, দেশ বলে ভাবনারও কোনো কারণ নেই। আছে গোটা পৃথিবী। এই অবস্থানকে কি আমরা ঠিক বলবো? এ নিয়ে খুব গভীরভাবে ভাবি, কোনো সমাধান পেয়ে গেছি সে কথা

দাবি করে বলতে পারব না। আমি বরং আমাদের লেখক, কবি, চিন্ড্রবিদ ও অর্থনীতিবিদদের এ নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করবো।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আপত্তি থাকলে এখানেই আপত্তি। একা পৃথিবীতে আমরা কেউ বাঁচি না, বাঁচতে পারব না। আমি একটা বৃত্ত। আমাকে ঘিরে একটা ছোট বৃত্ত, তারপরে আরেকটা ছোট বৃত্ত, তারপরে আরেকটা, তারপরে আরেকটা যেখানে সবাইকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব। তার জন্য কি তৃষ্ণা নেই মানুষের? মানুষ কি অন্ধভাবে চলে? আমাদের মধ্যে যারা সমাজবিজ্ঞানী তারা কি বলবেন যে, মানুষ প্রাণী হিসেবেই এমন, মানুষ নিজে এটা বুঝতে পারে না, কিন্তু এভাবেই সে চলে।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমি যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হলাম আমার কোনো অতীত নেই, যার অর্থ কোনো বর্তমান নেই এবং ওই অর্থেই ভবিষ্যৎ তৈরি করাও কোনো ব্যাপার নেই। আমার ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মেছি, এই পৃথিবীর মুখোমুখি হব আমি নিজে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের এই মনোভঙ্গি নিয়ে ভাবনার কথা আছে – সে ভাবনাটা তর"ণদেরই করতে হবে। এই অবস্থানের সঙ্গে চমৎকার সাযুজ্য রেখে একটা বুদ্ধিবিরোধী দর্শন আমেরিকানরা বাতলে দিয়েছে, তারা বলছে, আছে শুধু কাজ। আমি মনে করি, এ দর্শনটাও পুঁজিবাদের সঙ্গেই যায়। বৌদ্ধিক ব্যায়ামের কোনো দরকার নেই, যা দরকার তা হলো কর্ম। দর্শনের কোনো দরকার নেই, দরকার শুধু প্রয়োগিকতার, যা কাজ দেয় সেটা ঠিক আছে, সেটাই সঠিক দর্শন। যেটা কাজ দেয় না, ফেলে দাও। আমেরিকানরা একইভাবে বলতে পারে, মার্কিন বলে বিশেষ কোনো কিছু আমাদের নেই, অতএব জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কিছু দাবি করি না। অ্যান্টি-ইনটেলেকচুয়ালিজম শোনায় ভালো।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এক জায়গায় বলেছিলেন, হাকলবেরি ফিন থেকে প্রবাহিত হয়েছে সব আধুনিক মার্কিন কথাসাহিত্য। তাহলে কি মার্কিনদের যে বিশিষ্ট কোনো পরিচয় নেই, সেটাই তাদের পরিচয়? হাকলবেরি ফিনের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে নিগ্রো প্রসঙ্গ। 'র"টস্'-এ নিগ্রোরা খুঁজতে চাইছে তাদের উৎস। আমার মনে হয় আমেরিকানরাও যে তাদের উৎস খুঁজে দেখতে চাইছে না, তা বলা যাবে না। সব ইউরোপের, সব জায়গা থেকে লোকেরা আমেরিকা গেছে। তবু বোস্টনে গেলে বোঝা যায় সেটা কতটা আইরিশ শহর। কোনো জাতিই আত্মপরিচয়হীন হওয়ার সংকল্প না করলে পরিচয় হারিয়ে ফেলে না।

আমরা যাই বলি, বাংলাদেশের যুবকরা তাদের সামনে পৃথিবী খুঁজে দেখবেই। খুঁজতে গেলেই তাদের ভাবতে হবে, দৃষ্টিটা বড় করতে হবে। তখন তাদের বের করতেই হবে, 'আমি বাঙালি' এ কথাটার অর্থ কি। এটা কি পেঁয়াজের খোসা যে

ক্রমাগত ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কোন বিচি নেই, শেষ পর্যন্ড় ফুরিয়ে গেল। নাকি খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছি, যেখানে কিছু একটা ধরতে পারছি।

তর"ণরা অনেক কিছু নিয়ে ভাবছে, কথা বলছে। তারা উত্তর-আধুনিকতার কথা বলছে, উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের কথা বলছে, দেরিদা-ফুকোর দর্শন নিয়েও কথা বলছে। তা তারা বলুক। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব নিয়ে ভাবনার সময় তাদের নিজেদের মেধাটা ব্যবহৃত হচ্ছে তো। ভাবনার পরে সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছুচ্ছে কে? দেরিদা-ফুকো নয় তো? নিজেরা কি? আত্মহারা আত্মসমর্পণের চেয়ে গণ্ডানিকর কিছু নেই কিন্তু। আধুনিকতার চিন্ড়াভাবনার মধ্যে মারাত্মক সব স্ববিরোধিতা, তাতে জড়িয়ে পড়লে পুতুলের নাচেই নেচে যেতে হবে। সে কারণেই খুব ভালো করেই ভাবা দরকার।

এটা ঠিক যে আমি সব সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারব না। বহু জিনিস আমার পছন্দ হবে না। কৃষিভিত্তিক সমাজ আমি এখনও পছন্দ করি। পণ্যভিত্তিক সমাজ আমার পছন্দ হয় না। সেখানে কোনো স্বস্ড়ি পাই না। একশ' তলা একটা ভবন দেখলে কোনো আনন্দ তো হয়ই না, শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। রাস্ড়ায় চিত হয়ে শুয়ে না পড়লে বোঝা যায় না ভবনটা কত উঁচু।

মানুষ আসলে যে জীবনটা যাপন করে, যে জীবনে সে বেঁচে থাকে, সেটার সবচেয়ে ভালো ব্যবহার কিভাবে হতে পারে, এটাই একমাত্র আলোচনার বিষয়। আমরা ফেনোমেনন হিসেবেই সব দেখি। সবটাই কি আমরা একবারে দেখি? আমরা বেছে নিই, ব্র্যাকেট করি। বাকিটা ছুঁড়ে দেই, অন্ড়ত সেখানটায় থাকি না। কাজেই মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তার বাইরে সে যেতেই পারে না।

# মধ্যবিত্তের গণ-সংস্কৃতি বনাম জনগণ সংস্কৃতি

সৈয়দ হাসান ইমাম

আদিকাল থেকেই এতদঞ্চলে শিল্প সংস্কৃতির দুটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবহমান। বাংলাদেশ বহুকাল পরাধীন ছিল তাই শাসকদের অনুগ্রহ প্রার্থী উচ্চবিত্ত বা তথাকথিত সুশীল সমাজ শাসকের ভাষা-সংস্কৃতি চর্চা করে নাগরিক এক সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। যা এদেশের মাটি-মানুষের ভাষা-সংস্কৃতির বিবর্তিত ধারার বিপরীতে এক আরোপিত নাগরিক আধুনিক সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

সংস্কৃত ভাষা ও আর্য্য সভ্যতায় গুণমুগ্ধরা বাংলায় এক স্বারস্বত সমাজ গড়ে তোলেন। তাঁরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিম্নবর্গের মানুষের অশালীন সংস্কৃতি বিবেচনায় অবজ্ঞা করতেন। অপর দিকে বাংলার আপামর জনগণ উচ্চবর্গের মানুষ ও শাসক সমাজের চরম অবহেলা, অবজ্ঞা ও অত্যাচার সহ্য করে নীরবে আবহমান বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রবহমান রাখেন।

মুসলমান নবাব বাদশাহ্‌রা বাংলা দখল করলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা ও আর্য্য সংস্কৃতির স্থান দখল করে ফার্সি ভাষা ও পারস্য সংস্কৃতি। ফলে সংস্কৃত শব্দ-প্রভাবিত বাংলার সঙ্গে ফার্সি ও আরবি শব্দ মিশ্রিত হয়ে নাগরিক বাংলা নবরূপ পরিগ্রহ করে। উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, পোষাক-আশাক ও খাদ্যাভাস প্রভাব বিস্তার করে নাগরিক জীবনে।

মুসলমান শাসকরা উপলব্ধি করেন গরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া বাংলায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রে বিভাজিত সমাজে শুদ্ররা সংখ্যা গরিষ্ট হলেও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে অচ্ছুৎ ছিলেন তাঁরা এবং সে কারণে তাঁদের অন্তরে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করতো। এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে মুসলমান শাসকরা ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে এঁদের অধিকাংশকে ধর্মান্তরিত করেন এবং তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে চলিত বাংলা ভাষায় পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়। জনগণের ভাষা এই প্রথম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু রাজকার্য ও বিচার ব্যবস্থা ফার্সি ভাষায় পরিচালিত হওয়ার কারণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে উচ্চবিত্ত সমাজে চলিত বাংলা ভাষা বা লোকজ সংস্কৃতি স্থান করে নিতে পারলো না।

বর্ণাশ্রম বিভক্ত হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজও আশরাফ ও আতরাফ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মোগল প্রবর্তিত উর্দ্দু ও আরবি-ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালি মুসলমান ও পশ্চিম থেকে আগত অবাঙালি মুসলমানরা নিজেদের রইস বা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ মনে করতেন। নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত

মুসলমানরা রইসদের কাছে অচ্ছুৎই থেকে গেলেন। তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতিরও একই অবস্থা হল।

এরপর এলো ইংরেজ । প্রথম দিকে অভিমানী মুসলমান রইস সমাজ ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতি বর্জন করলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সাদরে তা গ্রহণ করলেন। আশরাফ মুসলমানরা প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করলেন না বটে কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষের ভাষা-সংস্কৃতিও চর্চা করলেন না। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলমান শাসকদের প্রবর্তিত উর্দ্দু ভাষাকে আপন ভাষা ও আরবিকে ধর্মীয় ভাষা হিসাবে চর্চা করতে থাকলেন।

ইংরাজ শাসনের অবসানকল্পে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হলে ইংরেজরা হিন্দু সমাজের পরিবর্তে আশরাফ মুসলমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুর করলেন। এই সময় থেকেই ভারতের আশরাফ মুসলমানরা ইংরেজি ভাষা সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এই পরিবর্তন সীমাবদ্ধ থাকলো তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত নাগরিক মুসলমান সমাজে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর তার কোনো প্রভাব পড়লো না।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশকে দ্বিখি ত করে ইংরেজ প্রস্থান করলে পূর্ববাংলা হলো পাকিস্ড়ানের অংশ। শাসকগোষ্ঠী চেষ্টা করলো মধ্যপ্রাচ্য প্রভাবিত সংস্কৃতি ও উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের। আশরাফ প্রভাবিত মুসলিম লীগ ও তার মুষ্টিমেয় সমর্থক এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালো। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্ড়াবের বিরোধিতা করলো আশরাফ, আতরাফ, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালি। আতরাফরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সমর্থন করলেন বহু শতাব্দীর অবহেলা, অবজ্ঞা ও বাঞ্চনার অবসান ও নিজ ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য। আর আশরাফরা সমর্থন করলেন চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসম প্রতিযোগিতার ভয়ে । সকল বাঙালির প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্ড়ান সরকার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো । এর ফলে প্রমিত নাগরিক বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতি চর্চার পথ প্রশস্ড় হলো। কিন্তু গ্রামবাংলার চলিত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার হলো না ।

লাখো বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীনতা । প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাস্ড়ব অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না ।

বিশ্বমানচিত্রে ইংরেজ প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলো। সোভিয়েতের পতনের পর তা প্রায় নিরঙ্কুশ হলো। ফলে আজ মার্কিনি-ইংরেজি ভাষা ও তাদের সংস্কৃতি আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বের, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর ভাষা-সংস্কৃতি উদরস্থ করতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের দেশের নব্য আশরাফ শ্রেণী এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাচ্ছে । নাগরিক কথোপকথনে এবং

লেখায় এখন মার্কিনি শব্দের ছড়াছড়ি। আমাদের নাগরিক সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প, চারুকলা, পোষাক-আষাক, খাওয়া-দাওয়ায় মার্কিনি প্রভাব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গলদের মতো এখন এক শ্রেণীর তারুণ্য মার্কিনি ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের দ্বারা সার্বিকভাবে প্রভাবিত হচেছ। তাদের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ব্যাঙ্গের বস্তুতে পরিণত হয়েছে । যদিও এরা সংখ্যায় নগণ্য তবু এদের অভিভাবকরাই দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতির প্রণেতা ও নিয়ন্ত্রক । সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোরও এঁরাই মালিক। ফলে সুবিধাভোগী এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংকর সংস্কৃতিই আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আজও বিপন্ন।

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রাণপন লড়াই করছে বৈরী পরিবেশে। নীচু তলার মানুষদের উপর ক্ষমতাবানদের প্রভাব ও শাসন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় আদিকাল থেকে। পরকালের ভয়ে কুসংস্কারাবদ্ধ সাধারণ মানুষ এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় না।

হিন্দু সমাজে সাধারণ দরিদ্র অবহেলিত মানুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রী চৈতন্যদেব লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করলেন। নামকীর্ত্তন তখন হয়ে উঠলো সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। কায়েমী স্বার্থের অবসানের আশঙ্কায় পূরীর উচ্চবর্ণের পান্ডারা শ্রী চৈতন্যদেবকে হত্যা করে বলে শোনা যায় ।

দলিত হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রচেষ্টায় প্রায় একই সময়কালে বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বাউল সঙ্গীত ও ধর্ম নিম্নবর্গের বাঙালিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কীর্তন ও বাউল গানকে তাই বাংলা গণসঙ্গীতের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করে বাংলার মাটির গান। ইংরেজ শাসনের অবসানকল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশী যাত্রা ও গান অভিনীত ও গীত হতে থাকে। এই সব গান ও পালা প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর রচিত "এক বার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" এই সব গানের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ইংরেজ সাহেবরা এ দেশের অনিচ্ছুক কৃষকদের বলপ্রয়েগে বাধ্য করলো নীল চাষ করতে। কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতনের কাহিনী অবলম্বন করে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নাটকের মঞ্চায়নের সাথে সাথে শুধু বাংলায় বা ভারতে নয় খোদ ইংরেজ মুলুকেও প্রবল আলোড়ন উঠলো। ফলে নীল চাষ বন্ধ করতে হলো সাহেবদের। সম্ভবত নীলদর্পণই প্রথম গণনাটক যা এ দেশের রাজনীতিতে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করে।

এরপর এলেন বরিশালের মুকুন্দ দাস। লোকসংগীত ও যাত্রাপালার মাধ্যমে মাতিয়ে তুললেন বাংলার মানুষকে।

এতদিন 'ইংরেজ ভারত ছাড় আন্দোলন' ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার তা জনমনে সঞ্চারিত হলো। কংগ্রেসের নেতারা তাই মুকুন্দ দাসকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে গণসঙ্গীতের আবির্ভাব হলো। এরপর এলেন নজর"ল তাঁর অগ্নিবীণা নিয়ে।

১৯৩০ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়াদানে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলন। নেতাজী সুভাষ বোস ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুরোধে শচীন সেনগুপ্ত রচনা করলেন নাটক 'সিরাজ উদ্দৌলা'। নাটকের গান রচনা ও সুরারোপ করলেন নজর"ল। হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে মিলিতভাবে উদ্বুদ্ধ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এই নাটক।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মঞ্চে তখন আবির্ভাব হলো আব্বাস উদ্দিনের। আব্বাস উদ্দিন বাংলার ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালীকে নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করলেন। জয়নূল আবেদীন আঁকলেন দূর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মানুষের চিত্র। গণচিত্রাঙ্কনের পথিকৃৎ হলেন তিনি।

এই সময় বামপন্থী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত গণসংস্কৃতির প্রথম সংগঠন "ভারতীয় গণনাট্য সংঘ" Indian Peoples Theatre সংক্ষেপে আইপিটিএ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী মানুষ সৃষ্ট ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত হলো বিজন ভট্টাচার্য্যের নাটক 'নবান্ন'।

গণনাট্য সংঘে যুক্ত হলেন বাংলার প্রায় সব বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক। বিমল রায়, বিনয় রায়, বিজন ভট্টাচার্য্য, শম্ভুমিত্র, পরেশ ধর, তৃপ্তি মিত্র, সলিল চৌধুরী, হেমন্ড় মুখোপাধ্যায়, কলিম শরাফী, মহম্মদ ইসরাইল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রচিত হলো অসংখ্য সার্থক গণসঙ্গীত, কবিতা ও নাটক। মানিক বন্দোপাধ্যায় রচনা করলেন 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী'র মতো গল্প।

কিন্তু গণনাট্য সংঘের এই সংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমেই দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে এবং মধ্যবিত্ত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রভাবে তা যতোটা আন্ড়র্জাতিক হয়ে উঠলো ততোটা দেশজ হতে পারলো না। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে তা ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

১৯৬৬ সালে কৃষক নেতা কমরেড সত্যেন সেন ভারতের গণনাট্য সংঘের আদলে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর গঠনতন্ত্রে আছে সমাজ পরিবর্তন ও সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাই উদীচীর লক্ষ্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি

গণনাট্য সংঘের মতো উদীচীও নাগরিক মধ্যবিত্তের তথা কথিত পরিশীলিত সংস্কৃতির মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে বাংলার আপামর জনগণের উপর উদীচীর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। শ্রেণীচ্যুত হয়ে জনগণের কাতারে সামিল হওয়ার সংগ্রামে বামপন্থীরা বিশ্বাস করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ কি করা সমীচীন হবে না? উদীচীর লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে দূরে রেখে সমাজ পরিবর্তন কি সম্ভব? বিষয়টি উদীচীর বর্তমান নেতৃত্বকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

দেশ, জাতি, সমাজে আজ বিশাল পরিবর্তন এসেছে। শোষক এবং শোষণ পদ্ধতিও আর বিংশ শতাব্দীর আদলে নেই। তাই সে কালের গণসঙ্গীত আর গণনাটক এ কালের সংগ্রামের সাথী হতে সক্ষম হচ্ছে না। চাই সমকালীন সমস্যা ও তার বির"দ্ধে সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী গান-নাটক, গণসঙ্গীত।

মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো দূর"হ। প্রথমত মঞ্চ নাটকের দর্শক সংখ্যা সীমিত। দ্বিতীয়ত মাধ্যমটি এখনো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট জনপ্রিয় হয়নি। তাই সমাজ পরিবর্তনের কাজে যাত্রাপালা যতটা কার্যকর হবে মঞ্চনাটক ততটা হবে না।

আধুনিক সুর ও বাণীতে রচিত গণসঙ্গীত ততোটা কার্যকর হবে না যতোটা হবে লোকসঙ্গীতের কথা ও সুরে রচিত জন-গণসঙ্গীত। আর তাই মধ্যবিত্ত মানসিকতার চর্চা কমিয়ে জন-গণসংস্কৃতিতে অধিক মনোযোগী হওয়া উদীচীর কাছে প্রত্যাশা। উদীচীর বর্তমান নেতৃত্ব জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হবেন আশা করি ।

# অঙ্গীকার আর অসঙ্গতি

আবুল মোমেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল। ভারত বিভাগের অল্পদিন পরই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরও দেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা, বুদ্ধিজীবী মহল এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘুর উপস্থিতির ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিংবদন্তীপ্রতিম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তার জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কার্যত একাই লড়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মূলধারার রাজনৈতিক নেতারা পার্বত্য এলাকার মানুষের দুঃখ ও বেদনার কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার সময় সমর্থন দানে অস্বীকৃতি জানালেন হতাশ মানবেন্দ্র লারমা। তিনি বলেছিলেন, "এই সংবিধান বাংলাদেশে অন্য কোন জাতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো উল্লেখ নেই। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবন অভিশপ্তই রয়ে গেছে।"

১৯৭৪ সালের ২৩ জানুয়ারি পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে একটি "এক সংস্কৃতি ও এক ভাষার জাতি রাষ্ট্র" হিসেবে ঘোষণা করলে মানবেন্দ্র লারমা সংসদে দেওয়া ভাষণে আরো একবার তার জনগোষ্ঠীর উদ্বেগটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান উদ্বেগ হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি বিলুপ্তির হুমকির মুখে। আমরা স্বকীয় পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাই।" কিন্তু দেশের একটি অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নেতার ওই উদ্বেগ ও হতাশা সরকারের ওপর মহলের কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী উত্তুঙ্গ জাতীয়তাবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সাথে সার্বিকভাবে সিভিল সোসাইটিও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর উদ্বেগের বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন তো বটেই বস্তুত তেমন করে লক্ষ্যই করলেন না। এমনকি প্রচারমাধ্যমও পার্বত্য এলাকার মানুষের উত্থাপিত উদ্বেগের বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ সাড়া দিতে ব্যর্থ হলো।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আমরা উন্নয়নের নামে সেখানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী যেসব হস্ড়ক্ষেপ করেছি তার পরিণতি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা অস্বীকার করতে পারি না। বাঙালিরা পার্বত্য এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও মনোভাব বোঝার ক্ষেত্রে আবারো সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিলো। কাপ্তাই বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলো এই নিস্পৃহতা। পার্বত্য এলাকার মানুষ এসব প্রকল্পকে তাদের আত্মপরিচয় ও জীবনযাত্রার ওপর এক বড় ধরনের আঘাত বলেই মনে করছে।

কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ড় অঞ্চলে নৌচলাচল সুবিধা বাড়ানোর মতো বিভিন্ন উপায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদান রাখা। প্রকল্পটি বাস্ড়বায়নের পর এর সব উপযোগিতা পুরোপুরি বাঙালিদের পক্ষে গেছে। কারণ পাহাড়ি জনগণকে যেমন আস্থায় নেওয়া হয়নি তেমনি রাতারাতি নিজেদের জীবনধারা বদল করে ওইসব সুবিধা নিতেও চায়নি তারা। উপকার করার বদলে কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য এলাকার মানুষের ওপর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কাপ্তাই বাঁধ প্রায় ৪শ’ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন করেছে যার মধ্যে ছিল ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য জমি। এটি গোটা জেলার মোট চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশ। জলমগ্ন এলাকার মধ্যে ছিল মূল্যবান উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র সম্পন্ন ১০ বর্গমাইল সংরক্ষিত বন এবং চাকমা রাজবাড়িসহ গোটা রাঙামাটি শহর।

কাপ্তাই লেক হিসেবে সুপরিচিত সেই কৃত্রিম হ্রদ প্রায় ১৮ হাজার কৃষিজীবী চাকমা পরিবারকে নিঃস্ব করেছে। এ পরিবারগুলোর মোট সদস্যসংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এই প্রকল্পের ফলাফল হিসেবে শুধু বেঁচে থাকার জন্য দিনমজুরির মতো কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

সেই ছয়ের দশকে প্রায় ৬০ হাজার চাকমা সীমান্ড় অতিক্রম করেছে যাদের বেশিরভাগই কয়েকটি পার্শ্ববর্তী ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে আশ্রয় নেয়। বাকিরা যায় মিয়ানমারে। পার্বত্য এলাকার মানুষের এই দুর্ভোগ প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কিংবা তাদের সমর্থক অত্যুৎসাহী এলিট শ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। এরা উভয়েই তখন পাকিস্ড়ানি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রায় চার দশক পরেও আজ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারি এবং নাগরিক উভয় তরফের উপেক্ষা এবং অবহেলা মূলধারার জাতীয় চেতনা থেকে পাহাড়িদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে আরো পোক্ত করেছে।

সমতলে বসবাসকারী জাতিগত সংখ্যালঘুদের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থা একইরকম, হয়তোবা আরো খারাপ। এ দেশে যে বেশকিছু জাতিগত সংখ্যালঘু

রয়েছে। সে ব্যাপারে আমরা সচেতন হয়ে উঠছি মাত্র এক দশকের মতো হবে। ক্ষুদ্র জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব চোখে পড়তেই আমাদের প্রায় চলিণ্ঢশটি বছর কেটে গেল। অথচ ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা কেবল সংখ্যাগুর“ সম্প্রদায় থেকে নয়, নিজেরাও একে অন্যের চেয়ে পৃথক। আমরা তাদের অধিকার ও আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারিনি। তাদের পৃথক আত্মপরিচয় ও অভীষ্ট গন্ড়ব্যের স্বীকৃতি দেওয়া থেকেও অনেক দুরে রয়েছি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে প্রায় ৬৪ টি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বাস আছে। এরা হচ্ছে: অহমিয়া, বর্ন, বনাই, বসাক, বাকতি, বেদিরা, ভূমিজ, ভূঁইয়া, ভূঁইয়ালি, বম, চাকমা, চাক, ডালু, গারো, গুখা, হাড়ি, হরিজন, খাসিয়া, খাইরা, খিয়্যাং, খুমি, খা”া, কোচ, কোল, কর্মকার, কের, কান্ডো, লুসাই, লুরা, মামা, ম্রো, মনিপুরি, মাহাতো, মুন্ডা, মালো, মাহদি, মিখির, মুসাহার, ওরাওঁ, পাংখো, পাহাড়ীয়া, পাহান, পাল, পাত্র, রাখাইন, রাজোয়ার, রাই, রাংগুতার, রামদাস, র“হিয়া, রাজবংশী, শাক, সাঁওতাল, শিং তুরি, ত্রিপুরা, তেলি, উশুই।

দেশবিভাগের পর থেকে সমতলের শিল্প উদ্যোক্তা ও কৃষিজীবীরা প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জমি গ্রাস করছে।

সংখ্যালঘু এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আর্ত-সামাজিকভাবে প্রান্ড়িক অবস্থানে। সামাজিক-রাজনৈতিক পীড়ন এবং বাঙালিদের ভাষাগত ও সাস্কৃতিক আধিপত্য এ দুয়ে মিলে তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে তুলেছে। এটা সত্যি যে, জাতিসংঘ এবং আরো অনেক আন্ড়র্জাতিক সংস্থা সব ধরণের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য চার্টার ও ঘোষণাপত্র তৈরি করছে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় অনন্যতা এবং তা সংরক্ষণের গুর“ত্বের কথা মাঝে মধ্যেই উলেণ্ঢখ করা হয়। কিন্তু সুশীল সমাজের কিছু গ্র“প এবং এনজিও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছু সচেতনতা দেখালেও সরকার এবং সাধারণ মানুষের অধিকাংশই এখনো এসব ইস্যু ও সমস্যার ব্যাপারে দৃশ্যত অজ্ঞ ও উদাসীন।

বিদ্যমান পরিস্থিতি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের মূল ধারার রাজনীতি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছন্ন করে রাখছে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ড় একলাখ চাকমা ভূমিহীন ও গৃহহীন এবং ৬০ হাজার উদ্বাস্তু হয়েছে। সশস্ত্র সংঘাতে শান্ড়িচুক্তি সম্পাদন পর্যন্ড় (১৯৯৭) প্রায় দুই দশকে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীসহ নিহত হয়েছে প্রায় ২০ হাজার। জাতিগত সংখ্যালঘুদের অনেক বিশিষ্ট নেতা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্র“প কিংবা বাঙালি ভূমিদস্যুদের গুন্ডাপা”াদের হাতে খুন হয়েছেন বা সরকারী এজেন্সির হেফাজতে মারা গেছেন। এটা খুবই চড়া মূল্য যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ড়ি চুক্তি

স্বাক্ষরের পর এক দশকের বেশি সময় চলে গেলেও ওই অঞ্চলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কাজেই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

সংখ্যালঘুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশি সচেতন এবং বন ও জীববৈচিত্রের গুরুত্বের ব্যাপারেও ওয়াকেবহাল হতে হবে। কৃষিকাজ বেড়ে চলেছে এমন একটি জনবহুল দেশে কিভাবে এ বিষয়গুলো ঝুঁকির মুখে পড়ছে তা লক্ষ্য করতে হবে। দেশের বনভূমি প্রতিনিয়ত চাপের মুখে পড়ছে। এসব বিষয়ে আমাদের সচেতন ও অঙ্গীকার স্পষ্ট বা জোরালো নয় বলে বন ও সেই সঙ্গে তার অধিবাসীদের বিলুপ্তিই এদেশের বাস্তবতা হয়ে দাড়িয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মিডিয়ার অনেক কিছু করার রয়েছে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সচেতন। উপমাহদেশে এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও বৈরিতার মধ্যে পাশাপাশি সহাবস্থানের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের কাছ থেকে এই বিষয়টি বর্তেছে বাংলাদেশের ওপর। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এদেশে একটি নবযুগের সুচনা হয়েছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায়, বিশেষ করে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডলের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল আমরা আজো তার উপশম করতে পারিনি।

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুরা, পাকিস্তান আমলের মতোই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মতো একই মর্যাদা ও সওযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে এমন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আবহ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরি করতে আবারো ব্যর্থ হয়েছি আমরা।

মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতি-যা দেশের জঙ্গীগোষ্ঠীদের মদতদাতা উত্থান শুধু ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করেনি, এর ফলে সাধারণভাবে নারীসমাজও প্রথাগত সমাজপতিদের নিপীড়নমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো এবং সমাজে গৃহীত গণতান্ত্রিক উদ্যোগগুলো সাধারণভাবে পুরুষ প্রাধান্যবিশিষ্ট এবং তা নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের উপশম ঘটাতে পারেনি।

সমাজে  বিভেদ সৃষ্টির আরেকটি মোক্ষম হায়না হল শিক্ষা। স্কুল পর্যায়ে প্রধান তিনটি ধারা ছাড়াও সবদিক বিচার করলে প্রায় দশটি ধারা চালু রয়েছে। ফলে জাতিকে শিক্ষা ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে গোড়া থেকেই বহুধাবিভক্ত করে দিচ্ছে। অথচ আমাদের সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত জাতি গঠন করার উপযোগী শিক্ষা চালু করা এবং অবশ্যই তা হবে সবার জন্য একই রকম। কুদরাত-ই-খুদা কমিশনও (১৯৭৪) একই রকম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু আমরা তা বাস্ড়বায়ন করতে পারিনি।

আমাদের সমাজে বিভেদের আরো জায়গা আছে। দেশে ধনী ও গরিবের ব্যবধান বাড়ছে। সম্পদ জড়ো হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। দেশের উন্নয়ন সুষম হচ্ছে না। অনেক গুর"ত্বপূর্ণ জেলা শহর ও নগরী অবহেলার শিকার হচ্ছে যেখানে প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নয়ন হচ্ছে না। নগরীর চেয়ে পলণ্টী অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা বেশি। সমাজে বিদ্যমান এ অসাম্য লালন করছে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যকে যা তৈরি করছে অবিশ্বাস-অবিশ্বাস ও ঘৃণার সংস্কৃতি। আর এভাবে মানুষে মানুষে তৈরি হচ্ছে দূরত্ব।

এই বাস্ড়বতায় মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে। সে কাজে অবশ্যই নেতৃত্ব দেবে রাজনীতি, সুস্থ মানবিক সংস্কৃতিকে ধারণ করবে যা জাতিকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথে চালিত করবে। যদি শিক্ষার কথা বলি, তাহলেও বলব এমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই যা সুস্থ মানবিক সংস্কৃতির বাতাবরণে শিশু-কিশোর-তর"ণদের আলোকিত করবে। এসব কাজে এখনও বাম প্রগতিশীল শক্তিকেই পথ দেখানোর কাজ করতে হবে বলে আমি মনে করি। সেদিক থেকে উদীচীর সামনে আগামী দিনের জন্যে কাজের দায় কম নয়। তবে উদীচী তো দায়বদ্ধ সংগঠন, তাদের নয়তো কার কাছে আমরা প্রত্যাশা করবো।

# সত্যেন সেনকে খোলা চিঠি

মামুনুর রশীদ

প্রিয় সত্যেন দা,

আবারো প্রমাণ হলো মানুষের মৃত্যু হয় না। কত জায়গায় কত ভাবে সে বেঁচে থাকে। তোমার বেঁচে থাকার অনেক জায়গাই আছে। তবে তুমি সবচেয়ে বেশি বেঁচে আছো উদীচীতে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে তোমরা কয়জন যে চারাটি বুনেছিলে আজ সেটি বিশাল বৃক্ষ। ফলে ফুলে পলণ্ঢবে সে বিকশিত।

একদা ১৯৪২ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়েছিল। তদানীন্ড়ন অবিভক্ত ভারতে তা হয়েছিল ভারতের প্রগতিশীল শক্তির মুখপাত্র এবং জনগণের একটা বিরাট প্রেরণা। তখনকার কমিউনিস্টরা বুঝেছিলেন পার্টির জন্য বড় প্রয়োজন তার সাংস্কৃতিক শাখা। যারা শিল্প মাধ্যমকে জনগণের ভাবনার বিকাশের কাজে ব্যবহার করবে। তেমনি এক ভাবনা থেকেই আরো স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল উদীচীর। উদীচী দিগ্বিদিকে ছড়িয়েও পড়ল। আজ বাংলাদেশের জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ড় ছড়িয়ে পড়েছে উদীচী। জনগণের সংস্কৃতি চর্চায় সে নিবেদিত। যে কোন ছোট শহরেও গণসংস্কৃতির একটা ঠিকানা মেলেই।

একদা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিভক্তির ফল হিসেবে প্রগতিশীল শক্তিও বিভক্ত হয়েছিল। তার ফলাফলও আমরা দেখেছি। দেখেছি ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়। চীনের সমাজতন্ত্রের ব্যবসায়িক উত্থান। কিন্তু কোনটাই স্পর্শ করেনি তোমাদের উদীচীকে। ক্ষণিক বিষণ্নতা, বিভ্রান্ড়ি কাটিয়ে আবার সে এগিয়ে চলেছে। উদীচীর জন্মলগ্নে যে যুবকের বয়স ছিল ১৫ আজ সে ৫৫ বছরের প্রাজ্ঞ। বাংলাদেশের রক্তাক্ত জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ড় নানা অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ।

তোমাদের সেই উদীচীর আজ যথার্থ কর্ণধার যতীন সরকার। যোগ্য থেকে যোগ্যতর নেতৃত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে উদীচী। যে মানুষ পাকিস্ড়ানের জন্ম-মৃত্যু দর্শনের মতো ভাবনার অধিকারী তার যোগ্য নেতৃত্বে উদীচী এগিয়ে যাবে আরো সামনে।

সত্যেন দা,

তোমরা জান না কী ভয়াবহ যুদ্ধে, দার্শনিক আকালে প্রতিক্রিয়াশীলতার যুপকাষ্ঠে আমরা জ্বলছি। পৃথিবীটা আবারো সেই সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়েছে। জাতিরাষ্ট্রকে ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করার অপচেষ্টায় মেতেছে এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাই এ অবস্থা থেকে পৃথিবীটাকে বাঁচাতে পারে। রাষ্ট্র অমানবিক হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যোগ্য ব্যক্তি আসতে পারছে না। ছলে বলে

কৌশলে করায়ত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। সেই পরিস্থিতিতে উদীচীর ভূমিকা আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। দিবস পালন বা দু'টি একটি প্রতিবাদ করেই কি তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? অনেক মৌলিক কাজ করার আছে। ৪২ সালের গানগুলি গেয়েইতো আর হবে না। নতুন গান নতুন কবিতা চাই। চাই নতুন ভাবনা। দ্রুত বদলে যাওয়া বিশ্বকে নতুন গান শোনাতে হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ড় ধ্বংসস্ড়ুপে আলো ছড়াতে হবে।

আমি নাটকের লোক। তোমাদের উদীচী নাটকের শাখাও খুলেছে। বেশ ভাল নাটকের কাজও হচ্ছে। একদা যা সীমাবদ্ধ ছিল গানে, নাচে, কবিতায় তার সীমানা আরো বেড়েছে। আমাদের নাটক উদীচীর ভাবনায় সমৃদ্ধ হবে এই কামনাও করি।

সংস্কৃতি মানুষের কোন জায়গাটায় কাজ করে তা তোমার চাইতে আমি ভাল বুঝব না। সেই কাজটা কিন্তু বড়ই সূক্ষ্ম এবং কোমল। সে কাজ কোন উত্তেজিত বক্তৃতা, শেণ্ঢাগান বা মিছিলের কাজ নয়। একান্ড়ই ব্যক্তিগত, জীবনের গভীরে ভাবনার শিকড়ে ঢোকার কাজ। সে প্রক্রিয়া প্রকৃত অনুভবের। সে জায়গাটা স্পর্শ করা বড়ই প্রয়োজন। বাজার অর্থনীতি কবলিত, বিশ্বায়ন উপদ্রুত এই পৃথিবীতে সে জায়গা স্পর্শ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। পৃথিবীটা অকারণ ব্যস্ড়তায় ভুগছে। কর্মহীন ব্যস্ড়তায় মুঠোফোনের (তোমাদের সময় এসব ছিল না) ঝামেলায়, ইন্টারনেটের সহজলভ্যতায়, মিডিয়ার দাপটে ব্যাকুল উদভ্রান্ড় এই সময়।

এ সময় মানুষকে বাঁচানো বড় কঠিন। সেই বাঁচানোর দায়িত্বটা কখনো পড়ে যায় শিল্পীর হাতে। যেমন করে একদা টলষ্টয়, গোর্কি, চেখভ, দস্ড়য়ভস্কি, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ড়ের হাতে পড়ে যায়। কালের নবতর যাত্রার ধ্বনি যাঁরা শুনিয়ে গেছেন। একবিংশ শতাব্দির ভয়াবহ সংকটের কালে আমরা আছি যেখানে দ্রুত আশা ফুরিয়ে যায়। যেখানে পণ্য আর অর্থটা প্রধান নিয়ামক হয়ে যায়। আবার দ্রুত বদলেও যেতে পারে যেমন করে ফিরে আসছে ল্যাটিন আমেরিকা। চে গুয়েভারা বা ফিদেল। যেমন করে ধস নামছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পুঁজির বিশ্ব পড়ে যাচ্ছে বিশাল সংকটে। এ সংকট দ্রুত ঘনীভূত। ৯৫০ বিলিয়ন ডলার দিয়েও রাষ্ট্র বাঁচাতে পারছে না তার পুঁজিপতিদের। যারা একদিন পৃথিবীর শান্ড়িকামী মানুষের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে তারা আজ সবচেয়ে বেশি বিনিদ্র। কোন তত্ত্বই তাদের বাঁচাতে পারছে না। তাই ওদের রাত গভীর হচ্ছে। নতুন দিন সমাগত। কিন্তু সেদিনের কাণ্ডারিদের নতুন তত্ত্ব প্রয়োজন। ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োজন। তোমার বইগুলো আজ নতুন করে তাদের পড়া প্রয়োজন। যতীন সরকারের বই বোঝা দরকার। কীভাবে ধর্মরাষ্ট্রটার উত্থান হলো একটা অসাম্প্রদায়িক সমাজে।

এসব গুরুদায়িত্বই পড়ে যায় উদীচীর উপর। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব নেয়ার শক্তি কি উদীচীর আছে? আছে আবার নেইও। আছে বিশাল লোকবল, নিবেদিত কর্মী,

ভাবনা-সমৃদ্ধ মানুষ। কিন্তু এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাবার মতো গতিবান অনেক মানুষ কি আছে? তাও আছে কিন্তু তারা হয়তো থমকে আছে। উদীচী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়নি শুধু, মৃত্যু দেখেছে। শক্তি সেখান থেকেও অর্জন করেছে। সেই থমকে থাকা মানুষগুলোকে জাগাতে হবে। চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে থমকে গেলে চলবে না। ভয় এবং মৃত্যুকে জয় করতে হবে। সে মন্ত্রতো তোমরা দিয়েও গেছো।

আমি নাটকের লোক। টিনের তলোয়ার দিয়ে লড়াই করা আমাদের কাজ। কিন্তু তোমরা কলম দিয়ে, তত্ত্ব দিয়ে, গান দিয়ে আমাদের জাগিয়েছিলে। নতুন করে তোমাদের উদীচী আমাদের টিনের তলোয়ারটিকে ইস্পাতে ঝলসে দিক।

ইতি
তোমারই অমরত্বে গুণমুগ্ধ

# ‘উদীচী’ এক নক্ষত্রের নাম

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ

আদিকাল থেকে মানব এই নক্ষত্রের দিক নির্দেশনায় পথ হেঁটেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং সমন্বয় ঘটেছে এই পথচলায়। সৃষ্ট হয় এক বিশাল মানব জাতি। মানুষ সভ্যতার কঠিন সিঁড়ি ভেঙ্গে পৌঁছতে চেয়েছে এক স্বপ্নভুমিতে কিন্তু ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর শক্তি হিংস্রতা এবং লোভের কারণে মানুষের স্বপ্নের সমাজ, সাম্যের সমাজ গড়ে উঠেনি। সম্পদ ও পুঁজির অধিকার হারিয়েছে মানুষ। কতিপয় মানুষ দখল করেছে বিশ্বের সম্পদ ও পুঁজি। যে স্বপ্নভূমি যে রাষ্ট্রকল্পনা মানুষ আদিকাল থেকে লালন করেছে তা অর্জিত হয়নি। জনগণের হাত থেকে রাষ্ট্র লুট হয়ে গেছে। মানুষ বার বার নতুন করে লড়াই করেছে এই মানবতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছ থেকে তাদের প্রিয় স্বপ্নের রাষ্ট্রের মুক্তির লক্ষ্যে। কখনো সফল কখনো অসফল। কিন্তু থেমে থাকেনি মানবের মুক্তির কাফেলা। আমাদের এই জনপদের মানুষের হাজার বছরের মুক্তির সংগ্রাম গত শতকের পাঁচ এবং ছয় এর দশকে এসে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত হয়। নতুন রাষ্ট্রের পদধ্বনি শুনতে পায় বাঙালি জাতি। ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তির স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখার সেই কালে উদীচীর জন্ম। বিদগ্ধ ব্যক্তি সত্যেন সেন সঠিক সময়ে জাতির প্রয়োজনে সমমনস্ক ত্যাগী বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন উদীচী।

জন্মের মুহূর্তেই উদীচী সাংস্কৃতিক শক্তির সঠিক ব্যবহার করে জাগ্রত জাতির সংগ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে তাদের সুচিন্ড়িত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা প্রয়োগও করলো মুক্তিকামী জনতার সাথে উদীচীর শিল্পযাত্রা এক ও অভিন্ন হয়ে উঠে। ‘৬০ এর দশকে উদীচী রাজপথে সংগীতে সংগীতে উজ্জীবিত করেছে জনতাকে। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে উদীচী ছুটেছে রণাঙ্গনে মুক্তির সংগীত নিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনে উদীচী উচ্চারণ করেছে নির্ভীক উচ্চারণ। মৌলবাদ, ধর্মান্ধ অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে উদীচীর সংগ্রাম বিরামহীন ক্লান্ড়িহীন। উদীচীর লক্ষ্য অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই মৌলবাদীদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে উদীচী। শতশত কর্মীশিল্পী হতাহত হয়েছে। গত দুইদশকে মৌলবাদীদের হিংস্র আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে অগণিত সাহসী শিল্পী। পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে শত শত শিল্পীকে। কিন্তু উদীচী থেমে যায়নি– থেমে থাকেনি। রক্তস্নাত উদীচীর শরীর যেন আজ আরো উজ্জ্বল আমাদের সংগ্রাম ও সৃষ্টির ইতিহাস। আজ প্রগতিশীল সংগঠনের প্রতীক হয়ে গেছে উদীচী। আজ মৌলবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ

উচ্চারণ এবং আঘাতের নাম উদীচী। এ এক অভাবিত অর্জন। কিন্তু এ অর্জনের শরীরে শহীদের রক্তের দাগ জ্বলজ্বল করে সর্বদা।

আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না। জনতার জয় হবে। উদীচীর জয় হবে। এক সাম্যের এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমরা অর্জন করবোই। শহীদের রক্ত কখোনাই বৃথা যাবে না। উদীচীর চার দশকে এ  আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যয়।

# উদীচীর অবিরাম পথচলা

কামর“ল আহসান খান

উদীচী তার কার্যক্রম বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানাদেশে সম্প্রসারণ করেছে, একথা ভাবতেই খুব আনন্দিত হই। অনেক আগে প্রিয় সত্যেন দা একদিন আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে উদীচী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেসময় আমাদের বাড়িতে পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গানের বেশ প্রচলন ছিল। এসব অনুষ্ঠানে আমরা সবাই মিলে সমবেতকণ্ঠে কোরাস গাইতাম। সেই সুবাদে একদিন আমার বড় ভাই মঞ্জুর“ল আহসান আমাদের কয়েকজনকে রিহার্সেলে যাবার জন্য বললেন। আমরা সবাই বেশ উৎসাহের সঙ্গে সেদিন সেখানে হাজির হলাম। তারপর থেকে আমরা কজন তর“ণ নিয়মিত চামেলীবাগ থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে গানের রিহার্সেলের জন্য নারিন্দায় সাইদুল হক ভাইয়ের বাসায় চলে যেতাম। প্রথম দিন গোলাম মোহাম্মদ ইদু ভাই আমাদের নিয়ে প্রয়াত বিপণ্ঢবী সত্যেন সেনের লেখা গান 'ওরে ও বঞ্চিত সর্বহারার দল, শোষণের দিন হয়ে এলো ক্ষীণ' কোরাস গাইলেন। তারপরই নিজকণ্ঠে স্বরচিত গান ধরলেন সত্যেন দা 'মানুষেরে ভালবাসি এই মোর অপরাধ, মানুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী তাই দিয়ে রচি গান- মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাবো মানুষের দেয়া প্রাণ'। সত্যেন দা জেলখানায় থাকাকালীন এই গানটি রচনা করেছিলেন। এই গানের মধ্য দিয়ে সত্যেন দা মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ আর আত্মোৎসর্গের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর এরকম অনুভূতি এবং আবেগ দিয়ে আমরা শুর“ করেছিলাম উদীচীর পথচলা। পরে চামেলীবাগের একটি বাসায় রিহার্সেল করার মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়মিত কার্যক্রম শুর“ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালে গঠন করা হয় আহ্বায়ক কমিটি। সেই প্রথম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেসময় আমাদের সংগঠনের নামকরণ করা হয় উদীচী। উদীচীর ব্যানারে আমরা প্রথম বাংলা একাডেমীতে সফলভাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সত্যেন দা'র সভাপতিত্বে সেই অনুষ্ঠানে আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী এবং আরো অনেকে। আলোচনার পরে ইদু ভাইয়ের নেতৃত্বে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয় আর আকতার হুসেনের নাটক 'আলো আসছে' মঞ্চস্থ হয়। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানটি ব্যাপক দর্শকনন্দিত হয়েছিল। সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কলে-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে আমাদের গানের দল বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তর“ণ শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা এগিয়ে আসে আমাদের দলে। পর্যায়ক্রমে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি ও কাজের পরিধিও বাড়তে থাকে। আমাদের সংগঠনিক কাজকে আরো সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষা হোসনে আরা ও

সাহেদ ভাইয়ের বাসায় সত্যেন দাকে সভাপতি ও মোস্তফা ওয়াহিদ খান সাধারণ সম্পাদক করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়, আমি সেই কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করি। সেই সূত্র ধরে ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা-কর্মী আমাদের দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে মঞ্জুর মোর্শেদ, সেন্টু রায়, ইকরাম আহমেদ, মলিণ্ঢক, বদরুল আহসান, সেলিনা, নকীব, আমেনা বেগম, ইকবাল, রিজিয়া বেগম, তাজিম সুলতানা, শামীমা, স্বপন ভাবী উলেণ্ঢখযোগ্য। পরের বছর আমরা উদীচীর প্রথম জাতীয় কাউন্সিলের আয়োজন করি। ব্যাপক জমায়েত ও বিভিন্ন স্ড়রের শিল্পীদের নিয়ে আমাদের এই আয়োজন ছিল উদীচীর জন্য একটি বিশেষ মাইলফলক। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমরা একটি তহবিল গঠন করেছিলাম। সেদিনের অনুষ্ঠানে শহীদ আলতাফ মাহমুদের পরিচালনায় গানের সাথে 'ম্যায় ভুখা হু' নামের চমৎকার একটি ছায়ানৃত্যও পরিবেশিত হয়েছিল। এর সাথে আরো যুক্ত ছিলেন চিত্রপরিচালক নুরুল হক বাচ্চু, আকতার হুসেন, মোফাজ্জল হোসেন মায়া, কাজী দুলুসহ আরো অনেক। শিল্পী এমদাদ ভাই, হাশেম খান, আনোয়ার ভাই আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে উদীচীর কার্যক্রমের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। শিল্পকারখানা, অফিস ও ছাত্র জনসভাগুলোতেও উদীচী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে শুরু করে। বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে পথনাটক, গণসঙ্গীত আর শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ব্রতচারী নৃত্য। সমগ্র দেশবাসীর পাশাপাশি গণজাগরণের সঙ্গে উদীচী সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। গণজাগরণের পক্ষে গান গাইবার জন্য বেতার-টেলিভিশন থেকেও আসতে থাকে আমন্ত্রণ।

আমিসহ উদীচীর অনেকেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে উদীচীর শিল্পীরা গান গেয়ে গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করে তুলতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একপর্যায়ে আমি পার্টির নির্দেশে আগরতলা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্থল ও নদীপথ অতিক্রম করে আমাদের প্রিয় সত্যেন দাকে পৌঁছে দেই আগরতলায় আমাদের গেরিলা বাহিনীর ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতেও আমরা উদীচীর জনপ্রিয় গানগুলো সমবেত কণ্ঠে গাইতাম। আমি প্রায়শই গাইতাম 'মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাবো মানুষের দেয়া প্রাণ'। গানটি গাইতে গাইতে চোখে জল এসে যেত, জীবনকে তখন খুব তুচ্ছ মনে হত। আমরা তখন মানসিকভাবে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

স্বাধীনতার পরেও আপন লক্ষ্যে অটল থেকে উদীচী সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। উদীচীর এই পথচলা কখনো খুব মসৃণ ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বরাবরই উদীচীর অগ্রযাত্রা রুখে দিতে চেয়েছে। কিন্তু যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে নারকীয় বোমা হামলা, হত্যাসহ কোন বাধাই উদীচীকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

আজো উদীচী প্রত্যন্ড় অঞ্চলসহ দেশব্যাপী তাদের কর্মকা পরিচালনার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানুষ ও স্বদেশের জন্য প্রতিশ্র তিবদ্ধ। স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উদীচীর কর্মকা আজ সম্প্রসারিত হয়েছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বাঙালি অধ্যুষিত পৃথিবীর নানা দেশে। এর পরিধি আগামীতে আরো বিস্ড়ৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি উদীচী অতীতের মত আগামীতেও দেশে-বিদেশে প্রগতিশীল শিল্পচর্চার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে দেশপ্রেমে, জাগ্রত করবে শোষণ ও নির্যাতনের বির দ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালিদের সহযোগিতায় উদীচী দেশী-প্রবাসী সকলকে নিয়ে অন্যায়, অবিচার ও শোষণ-বঞ্চনার বির দ্ধে র খে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। সাহিত্যিক, মানবদরদী, বিপণ্ঢবী সত্যেন দা আমাদের হাতে যে পতাকা তুলে দিয়ে গেছেন, আজো যা সাহসের সাথে বহন করছে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত তাঁর উত্তরসূরীরা, তাদের সকলের প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আগামীতে সুখী, সমৃদ্ধশালী, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা ও শান্ড়িপুর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তাদের ভবিষ্যতের কার্যক্রমকে আরো শানিত করবে।

জয় হোক উদীচীর

*প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।*

# শিল্পীর দায়বদ্ধতা

ড. সফিউদ্দিন আহমদ

মৃত্তিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রচ— জীবন তৃষ্ণা এবং মানুষ ও পরিবেশের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা বিশেষ করে গণমানুষের সাথে একাত্মতা না থাকলে কালজয়ী শিল্পী হওয়া যায় না। গণমানুষকে উপেক্ষা করে শুধু কলাকৈবল্যবাদের প্রবক্তা হয়ে বা শুধু নন্দনতত্ত্বের তাত্ত্বিক হয়ে মানুষের হৃদয়ও জয় করা যায় না।

ব্যাস-বাল্মীকি, হোমার-সফোক্লিস, কালিদাস-শেকস্‌পিয়র, গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো ও পাবলো নের—দার শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকা ও মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং এজন্যই তাঁরা মহৎ শিল্পী ও কালজয়ী শিল্পী। জীবনের এক প্রান্‌ড়ক পর্বে রবীন্দ্রমানসে এ বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বলেই তাঁর নন্দিত উচ্চারণ-

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নেই সেই নিন্দার কথা-
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সেই সর্বত্রগামী
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

এজন্যই মাটির কাছাকাছি ও মানুষের একাত্মতায় না এলে কোন মহৎ শিল্পী হওয়া যায় না। কারণ আমরা জানি বিরাট বটগাছ মূলোৎপাটিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু টিকে থাকে দুর্বাঘাস। রাজা ও রাজ্যের পতন ঘটে কিন্তু টিকে থাকে জনতা। ওরা না হলে কারখানার ভোঁ বাজে না, কলের চাকা ঘুরে না, কালের রথ চলে না- জীবনের শেষ প্রান্‌ড়ে রবীন্দ্রনাথ এ উপলব্ধি থেকেই বলেছেন-

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে-
ওরা কাজ করে

নগরে প্রান্ড়রে
রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
.... .... .... .... ....
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।

হিংসাপরায়ণ ও জিঘাংসা মনোবৃত্তিসম্পন্ন জিউস মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু জয় করেছে মৃত্তিকাস্পর্শী মানব দরদী প্রমিথিউস।

দার্শনিকেরা সাধারণ মানুষের সাথে পরিচিত নন। কারণ তাদের দার্শন ও তত্ত্ব সাধারণ মানুষ বুঝে না। অথচ বিশ্বের তাবৎ মানুষের কাছে সক্রেটিস পরিচিত। দর্শনকে তিনি যেমন লোক জীবনের নৈকট্য দিয়েছেন তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নেমে এসেছেন। তাই সেদিন তিনি এথেন্সের জনাকীর্ণ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'একজন মানুষের কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন বড়ো নয়, তাকে শুধু দেখতে হবে, স্বীয়কার্য সাধনে সে কোন অন্যায় বা অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে কিনা এবং সে মহৎ কিংবা হীন কোন জীবন যাপন করছে কি না'।

বার্ট্রান্ড রাসেল ও জাঁ পল সার্ত্রে বিশ্বমানবের হৃদয় জয় করেছেন তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বের জন্য নয়। এ দু'জন মহান দার্শনিক সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন ঔপনিবেশিকতার বির"দ্ধে, লড়েছেন মানুষের মুক্তি ও মানুষের স্বাধীনতার জন্য। তাই জনতার কাছে তাদের বিপুল পরিচিতি।

সেদিনকার ইংলন্ডের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিম"ল গ্রিন, কিড আর মার্লোর পা"ত্যের প্রতাপে প্রকম্পিত কিন্তু তারা জনগণের হৃদয়কে ছুঁতে পারেনি। অথচ জনগণের হৃদয়কে জয় করলো জন বেনসনের ভাষায়: Small Latin and less Greek জানা শেকস্পিয়র। কারণ সাহিত্য জগতে শেক্পিয়র এসেছিলেন জনগণের হৃদয়ের স্পন্দন ও ভাষা নিয়ে।

এ মৃত্তিকা ও জীবন তৃষ্ণার আকর্ষণেই মিল্টনের শয়তান ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়প্রত্যয় ও জীবন জিজ্ঞাসার চেতনায় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মারলো ও গ্যায়টের ফাউস্টের মধ্যে যে প্রচ" জীবন-জিজ্ঞাসা ও তৃষ্ণা, তা প্রতি পলে পলে আমাদের জীবনকে নতুন উপলব্ধির চেতনায় চকিত করে তুলে। ভীর"তা, দুর্বলতা, কাপুর"ষতা ও অজ্ঞতা পরিহার করে শয়তান আমাদের শিখিয়েছে প্রতিনিয়ত যুক্তিহীনতার বির"দ্ধে প্রতিবাদ করতে, এক নায়কত্বের বির"দ্ধে বিদ্রোহ করতে– কার্যকারণ ছাড়া কোন কিছু না মেনে শির উত্তোলন করে দাঁড়াতে। এজন্যই সে King can do no wrong এর প্রতিবাদে বলে ওঠে It is better to reign in hell

Then serve in haven.

জীবনকে প্রচ ভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুভব করে, ভোগ করে, ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা হতে নিজেকে মুক্তি দিয়ে পলে পলে নতুনত্বের সন্ধানী হতে শিখিয়েছে ফাউষ্ট। জীবন হবে প্রতিদিনকার প্রভাতী সূর্য আর বহতা নদীর মতো- বৈচিত্রহীন ও তৃষ্ণাহীন জীবন মানেই র দ্ধ জীবন। তাই অন্তিমক্ষণেও ফাউস্ট বলেছেন,'Light more light'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনীর চাপে মানুষ ও মানবমহিমা অবমানিত। হিংসাপরায়ণ ও হীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন এ সব দেবদেবীর রোষকবলে মানুষ হয়েছে নির্যাতিত ও অপমানিত। কারণ নেই, যুক্তি নেই, দেবতার হাতে মানুষ দাবার গুটি মাত্র, এরই মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো জীবনতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল 'মনসা মঙ্গলের' কবির মধ্যে। অমার্জিত, অসংস্কৃত, ক্রুর মনসাদেবী-

যার জাতি নাই, গোত্র নাই শিব সুতা বলে।
মহেশের কুমারী শুনেছ কোন কালে।।
'ধামেনা ভাতারী' কাণি আপনা বাখানে।
পরিত্যাগ করে মুনি গেল সে কারণে।।
ভালে ভালে পালাইয়া গেলা লঘু জাতি।
মম পুরে আসি নাম ধরে পদ্মাবতী।।
চেঙ্গ বেঙ্গ খায় সদা থাকে খালে বিলে।
এ ছার এড়িয়া দেবী কোন ছারে চলে।।

সত্য, সুন্দর আর গভীর জীবনতৃষ্ণার তাড়নায়ই চাঁদ সওদাগরের এ বিদ্রোহ। সে মঙ্গল ও সুন্দরের উপাসক, অমার্জিত, অসংস্কৃত মনসাকে সে পূজো করবে কেনো?-
যেই হস্তে সানন্দে পূজিনু হর গৌরী।
সেই হস্তে এ কাণিরে পূজিতে না পারি।।
দেবদেবীর স্বার্থপরতার বির দ্ধে এ বিদ্রোহের জন্যে চাঁদ সওদাগর বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী পুর ষ।

মঙ্গল কাব্যের আর একজন জীবনপিপাসু কবি, জীবনকে যিনি দেখেছিলেন গভীর বাস্তবতার মুকুরে। তিনি জীবন শিল্পী ও জীবনপিপাসু কবি মুকুন্দরাম। রাজসভার কবি বা শাসক তোষণের কবি তিনি নন। মানুষের কবি, দুঃখের কবি–কিন্তু দুঃখবাদী নন। দুঃখ, দারিদ্র্য আর অভাব, অত্যাচার ও যন্ত্রণার হলাহল তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন, মৃত্তিকার রসে তাঁর মন প্রাণ ছিলো সিক্ত। দেবতার কাল্পনিক আস্ফালন আর অলৌকিক মহিমার কাছে মানুষই উজ্জ্বল এবং মানবমহিমাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই শিব ঠাকুর দেবত্ব হারিয়ে সাধারণ মানুষ হয়ে ফুটে ওঠেছে এবং সে কুঠার বন্ধক দিয়ে ক্ষুদ-কুড়া আনে, পার্বতী দেবী-মহিমাকে তুচ্ছ করে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাড়িত জীর্ণ কুটিরের গৃহিনীরূপে আমাদের কাছে নেবে এসেছে, আর কালকেতু

জীবন সংগ্রামে দৃঢ় প্রত্যয়ী। মুকুন্দরাম যুগযন্ত্রনা আর বাস্ড়্বতার কবি বলেই এ চিত্র আঁকতে পারেন-

সরকার হইল কাল- খিলভূমি লিখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় প্রতিদিন।।

নব্য বাঙালীদের মধ্যে তখন জীবনচেতনা ও স্বদেশপ্রেম পাখার পালক মাত্র উঁকি দিয়েছে; এ সুরের প্রতিধ্বনি আমরা শুনি গুপ্ত কবির কণ্ঠে-

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখে দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।

মৃত্তিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রচ- জীবনতৃষ্ণার ফলেই মধুসূদন বিদ্রোহী, তাঁর রাবণ রামায়ণের রাবণের মতো অমার্জিত, অসংস্কৃত, নরখাদক রাক্ষস বা পিশাচ নয়, সে দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদ; আর রাম সেখানে পররাজ্য আক্রমণকারী। জীবনের প্রতি গভীর তৃষ্ণা আর মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার ফলেই রাবণের কণ্ঠে মধুসূদনের অন্ড়্রাত্মার প্রতিধ্বনি শুনি-

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছি গলে,
প্রচেত, হা ধিক, ওহে জলদল পতি!
একি সাজে তোমারে, অলজ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

... ... ... ...
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখোনাগো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

আত্মচেতনা ও জীবনজিজ্ঞাসার তাড়নায়ই বিহারী লাল বলেছিলেন-

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মর-র মতন
চারিদিকে ঝালা পালা,

উঃ কি জ্বলন্ড় জ্বালা!
অগ্নিকুন্ে পতঙ্গ পতন।

রবীন্দ্রনাথও গোমতীর জলে দেবীকে নিক্ষেপ করে বলেছিলেন-
'গেল এবার পাপ গেলো'

প্রচন্ড জীবন তৃষ্ণা ছিল নজরুলের। তাই তিনি বলেছেন-
বন্ধুগো আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এই রক্ত-লেখা
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ!

বাংলাদেশ, বাংলার মাটি ও পরিবেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিলো 'রূপসী বাংলার' কবির। শালিক, পেঁচা, চিল, শকুন, হিজল, তমাল, জারুল, দেবদারু, শটিবনের সাথে কি গভীর হৃদ্যতা কবির।

কবি সুকান্ড় মৃত্তিকার আকর্ষণ ও জীবনতৃষ্ণায় ছিলো সচকিত। জীবনকে দেখেছিলো গভীর বাস্ড়বতায়, মেহনতী মানুষের সাথে একাত্মতা বোধ করে তাদের সংগ্রামকে লক্ষে পৌছে দেবার কি সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল সুকান্ড়।

১৯৭১ সানে ২১ অক্টোবর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন নেরুদা। ১৩ ডিসেম্বর পুরস্কার গ্রহণকালে স্টকহামে তিনি যে ভাষণ দেন- এ ভাষণের সাথে সাহিত্যে অন্যান্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের ভাষণের কোনও সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে তাঁর কবি হয়ে ওঠা, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ এবং দেশ, মানুষ ও জনগণের প্রতি তার অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো তিনি যেন চিলির মাটিতে পা রেখেই এ ভাষণ দিয়েছিলেন। এবং খোঁজ করেছেন জাতিসত্ত্বা ও শিকড়ের সন্ধান আলোর উৎস সন্ধানের ভাষণের কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করছি-

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কোন বই পড়ে কবিতা লিখতে শিখিনি। কাউকে আমি শেখাতেও পারব না কী করে কবিতা লিখতে হয়। আজকের এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সেই দিনটির কথা মনে করলে কিছু ভাবনার সৃষ্টি হয়। সেই ভাবনাগুলোকে আমি ভেজাল শব্দবন্ধ দিয়ে প্রকাশ করি না, কিন্তু নিজের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। তাই আমার এই পথচলার কাহিনী দিয়ে একটা কবিতা তৈরি হয়ে যায়। তাতে আমি মাটি থেকে উপাদান নিই, আত্মা থেকে উপাদান নিই। আমার কাছে কবিতা একটা কাজ, একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী কাজ, যার মধ্যে মিশে আছে একাকীত্ব, ভাবনার বিশ্বস্ড়তা, আবেগ ও গতি, নিজের কাছে আসা,

মানুষের কাছে আসা, প্রকৃতির গোপনীয়তার প্রকাশ, আমি প্রবলভাবে বিশ্বাস করি মানুষ তার ছায়ার সাথে, আচরণের সাথে কবিতার সাথে যে আটকে আছে, মানুষের যে সমাজবদ্ধতার চেতনা, তা সম্ভব হয়েছে কারণ মানুষের একটা প্রচেষ্টা আছে স্বপ্ন আর বাস্ড়বকে একসাথে মেলানোর। কবিতা এই স্বপ্ন আর বাস্ড়বকে মেলানোর কাজটা করে। আমি যখন সেই পাহাড়ি নদী পার হচ্ছি, যখন ষাঁড়ের খুলি ঘিরে ঘিরে নাচছি, যখন সেই পোড়ো বাড়িতে স্নান করে শুদ্ধ হচ্ছি, তখন আমি জানি না যে আমিই এগুলো কবিতায় লিখে অন্যকে জানাচ্ছি না অন্যরাই তাদের বক্তব্যগুলো এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমায় জানিয়েছে। আমি জানি না আমার এই অভিজ্ঞতাগুলো আমারই তৈরি কিনা, আমি জানি না এগুলো সত্যি না কবিতা, এগুলো স্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলোই আমার কবিতার উপাদান। এই ঘটনাগুলো থেকেই কবি অন্যের কাছ থেকে অন্ড়র্দৃষ্টি লাভ করে। এমন কোন একাকীত্ব নেই যা অনতিক্রম্য। সব পথের শেষ একই- সবাইকে জানানো যে আমরা কে, আমরা কী, আমাদের একাকীত্ব ভুলে মুশকিলগুলোকে দূরে সরিয়ে স্ড়দ্ধতা কাটিয়ে আমরা পৌঁছব আশ্চর্য দেশে, সেখানে আমরা গাইব আমাদের দুঃখের গান, বা নাচব বেতালে কিন্তু সেই নাচ গানই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের বিবেক বা আমাদের সচেতনতা প্রকাশে আদিতম আচার, যা পালন করার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি আমরা মানুষ, আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সবার নিয়তি একই'।

নের"দার কবিতা কোনও আকাশ কল্পনা বা শুধু বিনোদন ও বিলাসিতার জন্য নয়- তাঁর কবিতার মাল-মশলা ও উপকরণ এবং বিষয়বস্তু তাঁর জীবন থেকেই নেয়া এবং তাঁর কবিতা তার অভিজ্ঞা ও প্রজ্ঞার ফসল। এজন্যই নের"দা বলতে পারেন-

'এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমি আমার কবিতার শরীরকে পেয়েছি। কবিতার প্রতি এই পৃথিবীর এবং আমার আত্মার দানকে আমি পেয়েছি সেইখানে। আমি বিশ্বাস করি যে কবিতা হচ্ছে স্বপ্রণোদিত একটি গতিশীল ক্রিয়া, যা ক্ষণস্থায়ী অথবা ভাবগম্ভীর হতে পারে। সেখানে একাকীত্ব ও একাত্মবোধ, আবেগ এবং কর্ম, নিজের কাছে ফিরে আসা, ফিরে আসা সমস্ড় মানুষ জাতির কাছে এবং সংগোপনে সাজিয়ে রাখা প্রকৃতির নিজস্ব রূপের কাছে, এই সমস্ড় অনুভূতিই সমান অংশীদার। আমি এটাও খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে এই সমস্ড়কিছুই বজায় থাকবে। নিয়ত বিস্ড়ৃত আমাদের সমষ্টিগত জীবনের ধারণা আর স্বপ্ন ও বাস্ড়বকে কাছাকাছি আনার একটা চেষ্টা বাঁচিয়ে রাখবে মানুষ এবং তার ছায়াকে, মানুষ এবং তার প্রতিদিনের জীবনকে, আর মানুষ এবং তার কবিতাকেও'।

একটি কদাকার পাথরকে কেটে কেটে যদি পিয়েটো হয়–সুষমা ম"িত ও বাঙময় শিল্প হয় তবে আদিম অসুন্দর পৃথিবীকে যারা শ্রমে ও ঘামে অর্থাৎ মেহনত দিয়ে সুন্দর করছে, এবং কলে, কারখানায়, ক্ষেতে খামারে যারা উৎপাদন করছে–তারা কেন কবি হবে না, শিল্পী হবে না। আসলে শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও

মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সংস্কৃতির বিকাশে সাধারণ মানুষের কোনও অবদান নেই–আমাদের এ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে–এবং আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, মেহনত হতেই সমস্ড় শিল্পকলার উৎস তবেই শিল্প ও শিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ণ হবে। তাই নের"দা বলেছেন–

সব কথা বলার পরেও এই কথা বলার থাকে যে ব্যক্তি হিসাবে কোনও কবি কবিতার শাসন কার্যে নিযুক্ত নেই এবং কোনও কবি যদি তার সাথীদের কাউকে অভিযুক্ত করবেন ঠিক করে থাকেন অথবা আর একজন যদি তাঁর বির"দ্ধে ন্যায্য অথবা অন্যায্য অভিযোগের মোকাবিলায় নিজের জীবনের কিছু অংশ নষ্ট করবেন ঠিক করে থাকেন তখন আমার বিশ্বাস একমাত্র অহঙ্কারই তাদের এভাবে বিপথে পরিচালিত করে।

জীবন, কবিতা ও মানুষ সম্বন্ধে পাবলো নের"দা আরো বলেছেন–

'কবি কোনও ছোটখাটো দেবতা বিশেষ নন। না, তিনি কোনও ভগবান নন। অন্যান্য শিল্প ও পেশায় যারা নিযুক্ত আছেন তাদের বাদ দিয়ে কোনও রহস্যময় বিধাতা তাঁকে আলাদাভাবে পছন্দ করে রাখেন নি। আমি অনেক সময়ই বলেছি যে আমাদের সেরা কবি হচ্ছে সে–যে প্রতিদিন আমাদের র"টি বানায়, আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী পাউর"টি প্রস্তুতকারক যে নিজেকে কখনই ভগবান মনে করে না সেই সেরা কবি। সে তার র"টির ময়দা বানানোর রাজকীয় কাজটি কোনও রকম ভণিতা ছাড়াই করে, উনুনের আগুনের মধ্যে সেঁকে সোনালী রং নিয়ে আসে তার মধ্যে আর সহমর্মিতার কর্তব্য হিসাবে আমাদের প্রতিদিনের র"টি পৌঁছে দেয় সে। আর যদি কবি এই সহজ চেতনাকে অর্জন করতে সক্ষম হন, তাহলে সেই সচেতনতা তখন এক বিশাল কর্মকা"ে রূপান্ড়রিত হবে, একটা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত যে কাঠামো তারই বিভিন্ন অংশে নিজের প্রকাশ খুঁজে পাবে সে, সাহায্য করবে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করতে, মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে একের পর এক তার হাতে এনে দেবে সোনালী র"টি, সত্য, সোমরস আর স্বপ্নদের। যদি কবি তাঁর আরদ্ধ কাজ, তাঁর চেষ্টা, তার কোমল সৌন্দর্য প্রত্যেকের এবং সবার হাতে তুলে দেয়ার এই কখনই না শেষ হওয়া সংগ্রামে যোগ দিতে চান তাহলে কবিকে অবশ্যই মানুষের ঘর্মজলে, র"টি আর পানিয়ে, মানুষের সামগ্রিক স্বপ্নে অংশ নিতে হবে। অবশ্যই তাঁকে যোগ দিতে হবে সেখানে। প্রত্যেক যুগে কবিতার বিশাল ব্যাপ্তি থেকে একটু একটু করে যেসব অংশ বাদ দিয়ে ফেলা হয়েছে, ক্ষয়ে গেছে তার শরীর, যেমন ক্ষয়ে গেছি আমরা নিজেরাও, সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার এই অনিবার্য উপায়েই কেবল আমরা কেবল ফিরিয়ে দিতে পারব সেইসব হারিয়ে যাওয়া প্রসারতা।

আমি মনে করি কবি হিসাবে আমার সম্পর্ক শুধু গোলাপ, সুন্দর সাদৃশ্য এবং সামাঞ্জস্যের সঙ্গে বন্ধুত্বে নয় শুধুমাত্র ভালবাসা এবং অন্তর্হীন চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও নয়, আমার সম্পর্ক সর্বদা বহমান মানুষের কর্মধারার সঙ্গেও, যাকে আমি আমার কবিতায় স্থান দিয়েছি। আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে আজকের দিনটিকে একজন অসুখী অথচ অতি উজ্জ্বল মনের কবি, যার যন্ত্রণা বোধহয় সমস্ত হতাশাগ্রস্ত আত্মার তুলনায় অনেক বেশি ছিল, তিনি লিখেছেন-'ভোর হবে, আর জলন্ত এক সহ্যশক্তি এবং ধৈর্যের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরা আমাদের আশ্চর্য সুন্দর শহরে প্রবেশ করব।'

কোন কোনও বিলাসী নন্দনতত্ত্ববিদ অভিযোগ করে থাকেন যে, নেরুদার কবিতা সাময়িক ও উদ্দেশ্যপ্রধান। কিন্তু আমরা ভুলে যাব না যে,সাময়িকতাকে ভুলে যাওয়াও মানুষ ও কালের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

গোর্কির সাহিত্য ও শিল্পকর্ম উদ্দেশ্য প্রধান হয়েও মহৎ শিল্পকর্ম। সমারসেট মম বলেছেন–

The value of art is not only for beauty but for right action.
অর্থাৎ শুধু সৌন্দর্য সাধন নয় উদ্দেশ্য সাধনও শিল্পকলার একটি মহৎ নিয়ামক।

কলাকৈবল্যবাদীদের দেশ, সমাজ ও মানবতাবাদ বিরোধী উচ্চারণ Art for art sake এক ধরনের প্রলাপও বটে। গ্রিক রোম পুড়ে যাবে আর নীরুরা মনের আনন্দে বাঁশি বাজাবে ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন মানববিধ্বংসী প্রলাপতন্ত্রে কেউ আস্থবান হতে পারে না। নিরন্নক্লিষ্ট মানুষকে বাদ দিয়ে যে সাহিত্য, একে প্রকৃত সাহিত্য বলা যায় না, এ যেনো কেবলই স্বপন করেছে বপন পবনে।

ভিক্টর হুগো বলেছেন–

গোনা কয়েকটা দিন মাত্র আমাদের আয়ু–এই দিনগুলি যেনো নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুড়ি মেরে না কাটাই।

একজন শিল্পীর অপমৃত্যু হতে পারে বিভিন্ন কারণে যেমন–১) দেশ সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়া। ২) আদর্শচ্যুত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রলোভন ও মোহের কাছে আত্মসমর্পন করলে। ৩) তাই দেখা যায়– অনেক শিল্পী কেউটের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় আবার দেখা যায়– আদর্শ ও মানুষের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ঢুড়া সাপ হয়ে বিবরে আশ্রয় নেয়। এখানেই শিল্পীর অপমৃত্যু।

দেশ সমাজ ও মানুষের প্রতি শিল্পীর একটা দায়বদ্ধতা আছে। এই দায়বদ্ধতা যিনি স্বীকার করেন না তিনি বরং দেশ, মাটি ও মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এই দায়বদ্ধতা শুধু স্বীকার নয়–একজন শিল্পী সমাজের যেখানে অন্যায় অত্যাচার ও

মিথ্যে আছে এর বির"দ্ধেও প্রতিবাদ করবেন৯। এজন্যই জোসেফ ম্যাটিসিনি বলেছেন–

Whenever you see any corruption by your side don't strive against it you must thereby society.

প্রত্যেক কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীর সচেতন থাকা উচিত যেনো দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা না করেন।

# জাতীয় চেতনা ও শিল্পকলা : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত

আবুল মনসুর

শিল্পকলার সঙ্গে জাতীয় চেতনার সম্পর্ককে একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একজন শিল্পীর সচেতন উপলব্ধি ও একাত্মতা হিসেবে বর্ণনা করা যায়। জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন – ঔপনিবেশিক পরিবেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা অত্যন্ত তীব্র, এমন কি আতিশয্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন এটা উপলব্ধ হয় যে শাসকশ্রেণী একটি জাতির চারিত্রিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছে। আহত জাত্যাভিমান সাধারণত প্রচণ্ড ভাবাবেগপূর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায় যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু যখন ঔপনিবেশিক শক্তি বিতাড়িত হয় এবং একটি জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তখন জাতীয়তার চেতনা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একটি নবীন জাতিকে সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার জন্য ভাবাবেগপূর্ণ জাতীয়তাবাদ যখন আর কাজে আসে না, ঔপনিবেশিক আমলের উগ্র স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে তাৎক্ষণিক সমাধানের স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে না তখনই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপের সন্ধান সূচীত হয়, – এতিহ্যের সঙ্গে পরম্পরায় গাঁথা একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা যা কী না একই সঙ্গে ভবিষ্যতের আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম এবং সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গেও ঐক্যসূত্রে বাঁধা।

শিল্পকলায় এ পরিচয়ের রূপ কী হবে? সৃজনশীল শিল্পকর্মে জাতিসত্তার পরিচয়কে বিধৃত করার এ বাসনা বস্তুতপক্ষে জাতীয় কৃষ্টির নির্যাস ও মৌল রূপকে সন্ধান করারই আকাঙ্খা। একজন সচেতন শিল্পী অন্য আর একজন সৃজনশীল কর্মীর মত নিজেকে সতত এ সন্ধানে নিয়োজিত রাখেন। শিল্পী নিজে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সব সময় সচেতন না-ও থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড তাঁকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে দেয় না। তবুও ব্যাপারটি এমনই যে একজন শিল্পী শিল্পে জাতীয়তা ও দেশজ উপাদান সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাঁর পক্ষে কোন একটি সুস্পষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো যথেষ্ট দুরূহ। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে তিনি জাতীয়তা অর্থে অতীতের পুনর্জাগরণ ও ঐতিহ্যের পুনঃপ্রয়োগ বুঝতে পারেন এবং অতীতের দিকে পিছু হঠতে পারেন, – অতীতমুখীনতার সঙ্গে ঐতিহ্য সম্পর্কে সমকালীন সচেতনতার প্রভেদ তিনি হয়তো উপলব্ধি নাও করতে পারেন। ইতিহাসের উদাহরণ থেকে দেখা যায় জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রায়শই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে পর্যবসিত

হয় এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণ সাধারণত পুনর্জ্জীবনমুখী জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। তবে অতীতের পুনর্জাগরণ যে সব সময়ই পশ্চাদমুখী ও রক্ষণশীল তা কিন্তু বলা যাবে না। এর একটি উপযুক্ত উদাহরণ হচ্ছে পঞ্চদশ শতকের য়ুরোপীয় রেনেসান্স। অতীতই এর অনুপ্রেরণা গ্রহণের উৎস হলেও এই জাগরণ শেষতক ইতিহাসের একটি অন্যতম অগ্রগামী ও চিত্তাকর্ষক সময়কালে পরিণত হয়। গোটা অতীতের ঢালাও অনুকরণ না ঘটিয়ে রেনেসান্সের মূল্যবোধগুলির মধ্যে শুধু অতীতের মৌল-চেতনা মেজাজকে উজ্জীবিত করা এবং মৌলিক মানবিক সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। দৃশ্যকলায়ও এর প্রকাশ ঘটেছিল শুধুমাত্র গ্রেকো-রোমান শিল্পের পুনর্জাগরণের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন নতুন নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানবদেহ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে শিল্পকে আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও বাস্ড়বানুগ করে তোলার সাফল্যে।

এর বিপরীতে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিল্পকলায় পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। রাজা রবি বর্মার য়ুরোপীয় রীতিতে ভারতীয় পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে বিবৃত করার প্রচেষ্টা ছিল অযৌক্তিক। কিন্তু এর বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী পুনর্জ্জীবনও ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবমাননা থেকে সৃষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ পশ্চাদমুখী স্বাদেশিকতা। রবি বর্মা চটপট, হয়তো সঠিকভাবেই, তেলরং মাধ্যমকে গ্রহণ করেন। কিন্তু জাতীয়তা ও ঐতিহ্য বলতে তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত রীতিবদ্ধ বিষয়বস্তুকেই বুঝতেন – আবেগপ্রবণ ধর্মীয় ও পৌরাণিক ঐতিহ্য। তাঁর মানসিক প্রকৃতিতেও কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল, ফলে তাঁর নায়ক-নায়িকারা যাত্রার পাত্রপাত্রীর বেশি কিছু হয়ে ওঠেনি, তাঁর সৃষ্ট শিল্পও সঠিকভাবে যুগের মানসিকতার প্রতিফলনে নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ভারতশিল্পের আদর্শ ও অতীন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্যের পুনর্জাগরণের জন্য হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের অক্লান্ড় আবেদন মূলত ছিল অজন্ড়া, ইলোরা, মুঘল ও রাজপুত শিল্পের চরিত্র ও শৈলীর পুনর্চর্চার আহ্বান। ভারত-শিল্পকে পাশ্চাত্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপারে তাঁর বিপুল অবদান সত্ত্বেও হ্যাভেলের মূল বিভ্রান্ড়ি ছিল তিনি এই শিল্পকে মৌলিকভাবে আদর্শবাদী ও লোকোত্তর বলে প্রতিভাত করাতে চেয়েছিলেন, এবং সেটিকেই এর উৎকর্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এর নান্দনিক ও সাংগঠনিক সৌকর্যকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেন নি। এই আচ্ছন্ন ধারণা হ্যাভেল সংক্রামিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে, যাঁরা পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল স্কুল' বা বঙ্গীয় চিত্ররীতির শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। এই বিভ্রান্ড় ধারণার মধ্যেই নিহিত ছিল বেঙ্গল স্কুলের সীমাবদ্ধতা। এতে শিল্পের একটা ধরণ দাঁড়ালো যা অজন্ড়া ও মুঘল ধারার অনুকরণে সৃষ্ট একটি রীতিসিদ্ধ ও প্রথাসর্বস্ব শিল্পধারা, কিন্তু অজন্ড়া বা মুঘল শিল্পের অন্ড়র্নিহিত শক্তি ও

যাথার্থ্য এখানে অনুপস্থিত। ফর্মের অস্পষ্টতা, দ্বিধাগ্রস্থ রেখা, অতি-কোমল ভঙ্গিমা আর সর্বোপরি উচ্চকিত ভাবপ্রবণতা এই শিল্পরীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ-প্রবর্তিত তথাকথিত বাস্ড়বতাবাদের কাছে আত্মসমর্পনের চেয়ে এটাও কম নৈরাশ্যজনক ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের আঁকা ছবি জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের জোয়ারে ভর করে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে অবস্থা ছিল নৈরাশ্যব্যঞ্জক। আবেগবর্জিত দৃষ্টিতে আশঙ্কার সঙ্গে অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামী। যুগের চাহিদার চাপে কুমারস্বামী সহানুভূতি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জননন্দিত ধারাকে সমর্থন দিয়েও হতাশা চেপে রাখতে পারেন নি এবং বলতে বাধ্য হয়েছেন 'It is not what the world has the right to expect from India'। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকেও এই সাময়িক ও উগ্র ভাবাবেগের সঙ্গে কখনো একাত্ম হননি। তাঁর বিশ্বজনীনতা কখনো এই আবেগী ও আত্মমুখী জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গিতে স্বস্ড়ি বোধ করে নি। ফলে এই অতীতমুখী শিল্প কখনো তাঁর সার্বিক সমর্থন পায়নি। তিনি সবসময় পাশ্চাত্যের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্পর্কে বিশ্বাস রেখেছেন। ১৯২৫ সালে এক বক্তৃতায় তিনি পরিস্কার ভাষায়ই বলেছেন যে আধুনিক ভারতীয় শিল্প রীতিবদ্ধভাবে ভারতীয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের কাছে বিদেশ থেকে লেখা চিঠিতেও তিনি তাঁদেরকে বারবার গ ির বাইরে এসে সমগ্র জগতের আহ্বানে সাড়া দিতে বলেছেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের নিজের শিল্পে হয়তো এ মানসিকতার স্বাক্ষরই মিলবে যদিও তা একান্ড় নিজস্ব ও অন্ড়র্লৌকিক। তাঁরই অনুপ্রেরণায় শান্ড়িনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর এবং স্বতন্ত্রভাবে যামিনী রায় ও অমৃতা শেরগিল আধুনিক ভারতশিল্পের উদ্বোধন ঘটাবার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এঁদের নিরীক্ষাগুলি কোন পরিপূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছানোর আগেই ভারত বিভক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের নিজস্ব শিল্প-আন্দোলনের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে যায় ঐতিহ্য ও পরম্পরার।

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ১৯২০-এর দশকের বিপণ্ডব-পরবর্তী মেক্সিকান শিল্পকলার। এই শিল্প সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিদৃষ্ট করায় কিভাবে শিল্প ও দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত, – প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে ঐতিহ্যকে পরিবর্তিত, পরিশীলিত, এমন কি বর্জনও করা যায় যদি তা তখনকার শিল্পের প্রয়োজন পূরণ না করে। এবং আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ সব শিল্পীরা তাঁদের অতি সমৃদ্ধ মায়া, আজটেক, ইন্কা ইত্যাদি সভ্যতার উপাদানকে ব্যবহার করেন নি। মেক্সিকোর বিপণ্ডবী ইতিহাসের

সামাজিক প্রেক্ষাপট দাবি করেছে সমুন্নত ও বড়মাপের শিল্প যা বিপণ্ঢবের চেতনাকে উজ্জীবিত ও সঞ্চারিত করবে। মেক্সিকান-ইন্ডিয়ানদের আদি শিল্প শক্তিশালী, কিন্তু প্রবলভাবে প্রতীকবাদী এবং ঐ প্রতীকসমূহ তাদের নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও ভৌতিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে না। ফলে এই শিল্প তখনকার প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ ছিল না, এবং শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যকে প্রেরণা ও শৈলী হিসেবে না নিয়ে খুঁজে নিলেন সমসাময়িক অন্য শক্তিশালী চিত্রভাষা যা তাঁদের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হল। বিপণ্ঢবের অর্জনকে স্থায়ী করবার জন্য তাঁরা বিশালাকৃতির ম্যুরালচিত্রে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন রীতির চিত্রমালা যা বিপণ্ঢবের বাণীকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল সমস্ড় জনগোষ্ঠির মধ্যে। রিভেরা, সিকেইরস, তামায়ো, ওরোজকো – এই সব মহান শিল্পীর তুলিতে স্বাধীন মেক্সিকো কথা বলে উঠেছে সেই দেশের মানুষের বোধগম্য ভাষায়। আমরাও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছি আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, কিন্তু আমাদের শিল্পকলায় সেই সংগ্রাম ও উদ্দীপনা উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বিধৃত হয়েছে এমন কথা বোধ হয় বলা যাবে না।

এর একটি সার্বিক ও প্রধান কারণ বোধ হয় – যে রাজনৈতিক চেতনা ও অঙ্গীকারে মুক্তির যুদ্ধটি হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের অনতিপরেই আমরা তা থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ড়ির গোলকধাঁধায় নিপতিত হয়েছি। একই কারণে ঐতিহ্য ও সমকালকে একত্রে জাগরিত করে স্বদেশ-অনুসন্ধানী আধুনিক একটি শিল্পধারা সৃষ্টির দুরূহ প্রচেষ্টায় আমাদের শিল্পীরা বেশিদিন নিয়োজিত থাকেননি। ফলে, বিশেষ করে চিত্র-ভাস্কর্যে লক্ষ্য করি স্বাধীনতাযুদ্ধ তেমন কোন কালজয়ী সৃষ্টির জন্ম দিতে পারেনি। আমাদের শিল্পীরা সাধারণভাবে প্রগতিশীলতা দ্বারা আন্দোলিত হলেও শিল্পকলায় দেশজ সমাজ-বাস্ড়বতাকে সমসাময়িক পটভূমিকায় প্রকাশের গভীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল নিবিষ্ট থাকেন না, সামান্য কিছু নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াসের পর গুটিয়ে যান আত্মমুখী ভাববাদের জগতে। ফলে শিল্পে তাঁরা প্রধানত আঙ্গিক-কৈবল্যের অনুসন্ধানী, গভীর জীবনবোধের সাক্ষাৎ সেখানে কচিৎই মেলে। দেখা যায় আত্মজৈবনিক, পলায়নবাদী ও নেতিবাদী মানসের নিজের সঙ্গে কথোপকথনকেই বহু শিল্পী আধুনিক হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করছেন। এই জীবনবিমুখতা এক ধরণের আত্মম্ভরী উদাসীনতার জন্ম দেয়। আমাদের শিল্প প্রধানত এই বিমুখ আত্মশণ্ঢাঘার মোহজালেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে।

সুখের বিষয় ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তৎপূর্ববর্তী আন্দোলনগুলি বাঙালির স্বদেশ অনুসন্ধানে নানা ভঙ্গিমার ইতিবাচক প্রত্যয় সংযোজিত করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী তর"ণ শিল্পীকূলের মধ্যে ৫০ ও ৬০-এর দশকের পশ্চিমমুখী প্রবণতার বেশ খানিকটা অবসান ঘটেছে। এ সব শিল্পীরা যেমন একদিকে পশ্চিমের সমসাময়িক শিল্প-প্রকরণকে আত্মস্থ করতে চাইছেন, একইসঙ্গে নিজস্ব ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিম"লের মধ্যে শিল্পের যাথার্থ্য অনুসন্ধানে অধিক পরিমানে নিয়োজিত হচ্ছেন।

শুধু ঐতিহ্য-সচেতন নয়, জীবন-সম্পৃক্ত হওয়ার প্রতিও এদের অঙ্গীকার অধিকতর বলে প্রতিভাত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নিজস্ব পরিচয়-সমৃদ্ধ ও সমসাময়িক কালের সমাজ-চেতনার চিহ্ন-বাহিত শিল্পের উদ্বোধন নবীন শিল্পীদের হাত দিয়েই ঘটবে এমন আশাবাদ অবশ্যই ব্যক্ত করা যায়।

# উদীচীর চার দশক

রতন বসু মজুমদার

পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন শ্রমজীবী মানুষ। প্রতিটি ইমারত গড়ে উঠেছে তাঁদের অসম সাহসী ত্যাগ, তিতিক্ষা আর নিরলস শ্রমের মধ্য দিয়ে। নিরন্ড়র শোষণ শাসন আর অত্যাচারে তাঁরা হার মানেননি। নিরাশার অন্ধকারে আত্মশক্তিতে আরও বেগবান হয়েছেন তাঁরা। নিরন্ড়র এই শ্রমজীবী মানুষ একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন নানা সাংসকৃতিক সম্পদ। গ্রাম কেন্দ্রীক এই বঙ্গভূমে লোকায়ত সংস্কৃতির অফুরান সম্পদ সৃষ্টি করেছের ব্রাত্য বাঙালি। সারি-জারি-টুসু-ভাদু-ঝুমুর-গম্ভীরা-কবিগান-তরজা-ভাটিয়ালি-ছৌ-রায়বেমো-
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিষ্ট নয়, সমাজের লোক মানুষ, ইতর অভিধায় চিহ্নিত ব্রাত্যজন সমাজের ব্যথা-বেদনা-আনন্দের বারোমোস্যা নন্দিত করেছেন। চর্যাপদের সময় থেকে আজও পর্যন্ড় এই মহান মানব সন্ড়ানরা অনন্ড় সাংস্কৃতিক সম্ভারে বাংলার সমাজকে পুষ্ট করে চলেছেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চার দশক আগে জন্ম নিয়েছিল মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়ে। প্রয়াত সত্যেন সেন ও মনীষী রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন উদীচীর স্থপতি আর প্রেরণা।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের আবহে যে সংগঠনের জন্ম, মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হাজার চেষ্টা করেও তার অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। সমস্ড় ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত করে উদীচী আজ পূর্ণ করছে তার গৌরবময় চার দশক।

আমাদের পথপ্রদর্শক রণেশদার কাছে প্রথম শুনেছিলাম উদীচী আখ্যান। ১৯৮৫ সালে যশোর উদীচীর শিল্পী সংগঠকরা প্রথম এসেছিলেন কলকাতায়, আমাদের আমন্ত্রণে। সেই থেকে আজও উদীচী আমার কাছে গর্বের, অহংকারের আর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

বিগত ২৫ বছরের বহু অমূল্য স্মৃতি আমাকে আন্দোলিত করে। মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার এ বঙ্গে বহু প্রতিকূল পরিবেশেও আমরা সাধ্যমত যে প্রচেষ্টার ব্রত গ্রহণ করেছি ভাষা সংস্কৃতি স্বাধিকার মঞ্চের পতাকাতলে, তার পেছনেও বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর আদর্শ অনুপ্রেরণার কাজ করে।

প্রয়াত রণেশদা তাঁর জীবনের শেষ তিন মাস আমাদের বাসায় থাকার ফলে আমরা এক ঋষির আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হই। ওঁর সান্নিধ্যেও সেই সময়কাল আমদের সমগ্র পরিবারের কাছে পরম শ্রদ্ধায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা ও পুরোধা সাংস্কৃতিক সংগঠক সৈয়দ হাসান ইমাম ও তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকা ের অনন্য শিল্পী সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া লায়লা হাসানের দীর্ঘদিন

কলকাতা প্রবাসের ফলে, তাঁদের সঙ্গেও এক নিবিড় আত্মীয়তায় আবদ্ধ আমাদের গোটা পরিবার। তাঁদের সুবিশাল অভিজ্ঞতার ডালি থেকে আমরা সাধ্যমত চয়ন করার চেষ্টা করেছি উদীচী-সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানব সংগ্রামের নানা উজ্জল অধ্যায়।

যশোর উদীচীর প্রয়াত খোকা ভাই ছিলেন আমার দাদা ও অভিভাবক। উদীচীর যশোর সম্মেলনের শেষ রাতে-ভয়ংকর বোমা হামলা এবং ষড়যন্ত্রের স্বরূপ দেখেছি। দেখেছি সহস্রাধিক উদীচী নেতা কর্মীদের দায়বদ্ধতা। খোকা ভাই, শহিদ, সুকুমার, হুমায়ুনের মত নেতা কর্মীদের প্রত্যয়ী সংগঠকের ভূমিকায় দেখেছি। সোহরাব-ডলি, রাণা, সেলিম, হাবিব– এরা সবাই আমার অনুজপ্রতিম। ইদু ভাইসহ অনুজপ্রতিম ভাই বোনেরা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে উদীচীর ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, আজও করে চলেছেন তাঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রিয়জন।

বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ড় উদীচী ফুলে-ফলে আরও পলণ্ঢবিত হোক। লোকায়ত-গণ-সংস্কৃতির অস্ত্র হাতে সমাজ বদলের অনুঘটক হয়ে উঠুক। উদীচী বাংলাদেশকে মহিমান্বিত কর৺ক যুগ যুগ ধরে। শ্রেষ্ঠ বাসভূমি হয়ে উঠুক প্রিয় বাংলাদেশ।

# বাংলা মাস ও বছর

সুব্রত মজুমদার

বাংলাদেশে কয়েক বছর আগে সরকারিভাবে প্রবর্তিত মাস ও বছরের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেকবারই ১৪ই এপ্রিল বছর শুর“ হয়। বছরের প্রথম দিন হিসাবে ঐ দিন সরকারি ছুটি থাকে এবং এর ফলে সাধারণ লোকেরা আনন্দ-উৎসব করতে পারে।

বাংলাদেশের নাগরিকেরা বাংলাদেশে প্রবর্তিত মাস-বছর গণনা-ভিত্তিক নববর্ষ পালন করবেন এবং ঐ দিন আনন্দ করবেন – এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্ভবত অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশে নতুন চালু করা বছর-মাসকে বাংলা বছর-মাস মনে করা দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে দুঃখের কারণ ঘটে যখন প্রায় সমস্ড় দেশে, বিশেষ করে ঢাকায় রমনার বটমূলে হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালি গত কয়েক বছর ধরে ১৪ই এপ্রিল কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী আবহমান বাংলার নববর্ষ পালন করছি মনে করে উলণ্ঢাসিত, আবেগ পণ্ঢাবিত হন।

বাংলাদেশে মাস-বছর গণনার যে পদ্ধতি সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে তার বছরের সংখ্যা এবং মাসের নামগুলি বাংলা বছর সংখ্যা ও বাংলা মাসের নামের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু এ দুটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাসের দিন সংখ্যা এবং বছর শুর“র হিসাব আলাদা। বাংলাদেশের এই নতুন হিসেবে মোটামুটি যথেচ্ছভাবে নির্ধারিত ত্রিশ বা একত্রিশ দিনে প্রত্যেক মাস হয়, এবং জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাসের পাশ্চাত্য বছর গণনায় চার বছর পর পর Leap year হলে সংশিণ্ঢষ্ট বাংলাদেশ বছরে অতিরিক্ত একটি দিন সংযুক্ত করা হয়। বছরের শুর“ ১৪ই এপ্রিল তারিখে।

আবহমান বাংলা বছর-মাস গণনার যে পদ্ধতি সেখানে বছর শুর“ হওয়া এবং প্রত্যেক মাসে কতদিন থাকবে তার সংখ্যা যথেচ্ছ নয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মভিত্তিক। মাসের নামকরণও জ্যোতিষশাস্ত্রের তথ্য-নির্ভর। এই পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো।

দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ এবং প্রায় সব তারা আকশে পূর্ব দিগন্ড়ে উদিত হয়ে ক্রমে পশ্চিমে অর্ধবৃত্তকারে সরে সরে প্রথমে উপরে উঠে পরে নিচে নেমে পশ্চিম দিগন্ড়ে অস্ড় যায়। মানুষ জেনেছে সূর্য-চাঁদ-তারার এই ঘোরা আসলে দৃষ্টি-বিভ্রম-পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে লাটিমের মত ঘোরে, তাই এরকম মনে হয়। সূর্য ও তারার এই ঘোরার মাপে আমাদের দিন-রাতসহ মোটামুটি ২৪ ঘন্টার এক একটি দিন হয়।

সূর্য, চাঁদ, তারাদের এই যে ঘোরার কথা বলা হল, এছাড়া আরো কিছু ঘোরা আমাদের চোখে পড়ে বেশিদিন ধরে রাতের আকাশের দিকে তাকালে। প্রথমে দেখি চাঁদ আর সকলের তুলনায় রোজ পিছিয়ে পড়ছে, যার অর্থ সে অন্যদের তুলনায় পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে, এবং এই সরার মাপ দিনে এক ঘন্টার কিছু কম। ফলে, চাঁদ কখনো সূর্যের সঙ্গে একসঙ্গে উঠে একসঙ্গে অস্ড় যাচ্ছে, যে কারণে রাত্রে কখনো চাঁদ দেখা যাচ্ছে না – এদিন আমবস্যা, আবার কখনো সূর্যাস্ড়ের সময় উঠে পরের সূর্যোদয়ে অস্ড় যাচ্ছে – এটি পূর্ণিমা রাত। সূর্যের প্রায় উল্টো দিকে থাকায় সমস্ড় রাত ধরে থাকায় পুরো গোল চাঁদ দেখা যায়।

চাঁদের সরে সরে যাওয়া ছাড়াও সব তারসহ আকাশটা যেন আস্ড়ে আস্ড়ে ঘুরে যাচ্ছে মনে হয়। আজ রাত ৮টার সময় আকাশের যেখানে বিশেষ তারাগোষ্ঠী (হয়তো বা বিশেষ আকার বিশিষ্ট) দেখছি, একমাস পরে ঐ সময় ঐ তারাগোষ্ঠী সেখানে থাকবে না, অন্য জায়গায় সরে যাবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই সরাটা একই দিকে এবং প্রায় সব তারারই এই গতি আছে। মানুষ জেনেছে এই সরার কারণ সূর্যের চারদিকে মোটামুটি ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসা। এই ঘুরে আসার সময়ের পরিমাপই ১ বছর।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রায় বৃত্তের মত একটু লম্বাটে পথে ঘোরে। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের এই পথ গোলাকার দৃশমান আকাশে আকা একটি বৃত্তের মতো। একে সমান বার ভাগের বিভক্ত কররে এক এক ভাগ ত্রিশ ডিগ্রী কৌণিক মাপের হয়। এই ধরনের ১২টি ভাগকে ১২টি রাশি এবং সম্পূর্ণ পথটিকে রাশিচক্র বলা হয়। এক একটি রাশিকে এক একটি তারাগোষ্ঠী আছে যাদের আকার অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে – মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এই তারাগোষ্ঠীর আকার সবক্ষেত্রে ত্রিশ ডিগ্রী মাপের নয়। অঞ্চলটি মোটামুটি চেনার জন্য এই নাম, কিন্তু পরিক্রমণের হিসাবের সময় ঐ অঞ্চলের ত্রিশ ডিগ্রী বেছে নেওয়া হয় এবং বাকি এই ত্রিশ ডিগ্রী মাপের কক্ষ-অংশ অতিক্রম করার সময়কে একমাস ধরা হয়।

পৃথিবীর কক্ষপথ যেহেতু উপবৃত্তাকার এবং সূর্য এর একটি উপকেন্দ্র বা নাভিতে (Focus) আছে, পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে সমান থাকেনা। আমাদের শীতকালে পৃথিবী কাছে থাকে, গ্রীষ্মকালে দূরে থাকে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের উল্টো দিকে হেলে থাকায় সূর্যের কাছে থাকার সময় এখানে শীতকাল। কাছে থাকার জন্য আমাদের শীতকাল অল্প সময়ে পৃথিবী ৩০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। গরমের দিনে অতটুকু কৌণিক মাপ পার হতে বেশি সময় লাগে। এর তারতম্যের কারণেই বাংলা শীতকালের মাস অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ সাধারণত ২৮/২৯ দিনের হয় গরমের মাস জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ ৩১/৩২ দিনের, আবার সম দিন-রাত এর মাস আশ্বিন, ফাল্গুন

মাস ৩০ দিনের হয়। ত্রিশ ডিগ্রী অতিক্রম করার সময়টি ঠিক পূর্ণ সংখ্যক দিন না হলে একটু কমবেশি করে মাসের সময়কে পূর্ণ সংখ্যক দিন বলে গণ্য করা হয়।

সূর্য আকাশে থাকলে কোন তারা দেখা সম্ভব না। তাই পূর্ণিমা রাতে যখন চাঁদ সূর্যের প্রায় উল্টো দিকে থাকে, তখন চাঁদকে তারাদের মধ্যে কোথায় আছে জানলে সূর্যের অবস্থানও জানা যায়। প্রতিমাসে পূর্ণিমা চাঁদের অবস্থান জানার সুবিধা হয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথকে আরো ছোট ছোট ভাগ করে। কক্ষপথকে এমনভাবে সমান ২৭ ভাগ করা হয় যেন প্রত্যেক রাশিতে এই ভাগগুলো ২ ১/৪ ভাগ থাকে। এই ২৭টি ছোট ভাগকে এক একটি 'নক্ষত্র' বলা হয়। প্রত্যেক নক্ষত্রে অবস্থিত বিশেষ তারার নামে নক্ষত্রের নামকরণ। এগুলো অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশেণ্ডষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্ড়, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী। বিশাখা নক্ষত্রে যে মাসে পূর্ণিমার চাঁদ থাকবে সে মাসের নাম বৈশাখ। এভাবে জ্যেষ্ঠায় থাকলে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়ায় থাকলে আষাঢ়, শ্রবণায় শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ বা উত্তর ভাদ্রপদ এ থাকলে ভাদ্র, অশ্বিনীতে আশ্বিন, কৃত্তিকায় কার্তিক, মৃগশিরায় মার্গশীর্ষ যা অঘ্রাণের অপর নাম, পুষ্যায় পৌষ, মঘায় মাঘ, পূর্ব ফাল্গুনী বা উত্তর ফাল্গুনীতে ফাল্গুন এবং চিত্রায় চৈত্র। বাংলা মাসের নামের উদ্ভব এই ভাবে।

পৃথিবীর নিজের চারপাশে ঘোরার অক্ষ দিক মোটামুটি ধ্রুবতারামুখী। এই অক্ষের দিক কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির থাকে না। পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষ সমকোণে অর্থাৎ খাড়াভাবে না থাকায় সূর্যের টানের ফলশ্রুতি হিসেবে অক্ষটি পৃথিবীর আবর্তনের তুলনায় অনেক অনেক ধীর গতিতে ঘুরছে। লাটিম যখন স্থান পরিবর্তন না করে একই জায়গায় একটু বাঁকা হয়ে ঘোরে তখন লাটিমের অক্ষও বেশ ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। পৃথিবীর বেলায়ও অনুরূপটি ঘটে। এর ফলে কক্ষপথের দুটি বিষুব বিন্দু (যেখানে পৃথিবী থাকলে দিন রাত্রির সমান হয়)। কক্ষপথ ধরে ঘুরতে থাকে অত্যন্ড় ধীর গতিতে। একে অয়ন চলন বলে। অয়ন চলনের ফলে পূর্ণিমা রাতে চাঁদের বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানের কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে সময় বাংলা মাস ও বছর শুরুর হিসাব শুরু হয়েছিল তার থেকে বেশ কয়েক শতাব্দী কেটে যাওয়ায় বর্তমান অবস্থানগুলি সামান্য ভিন্ন। বৈশাখী পূর্ণিমা সাধারণত বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। অন্য মাসের বেলায়ও তাই।

বাংলা বছর মাস গণনার এই পদ্ধতি যখন শুরু হয়েছিল তখন অশ্বিনী নক্ষত্র একটি বিষুব বিন্দু ছিল। বাংলা বছর যখন শুরু হয় তখন সূর্য অশ্বিনী নক্ষত্রের কাছে থাকে। তাই একটি বিষুব বিন্দু থেকে সূর্য পরিক্রমণের পরিমাপের শুরু অর্থাৎ বাংলা বছরের শুরু। অবশ্য অয়ন চলনের ফলে এ বিষয়েও কিছু পরিবর্তন

ঘটেছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও অশ্বিনী নক্ষত্রের কাছাকাছি জায়গা (বিষুব বিন্দু) থেকে আকাশগোলকে তারার অবস্থান জানার জন্যে ব্যবহৃত একটি স্থানাংকের পরিমাপ শুর" করা হয়।

বাংলা বছর শুর", মাসের নামকরণ ও মাসের দৈর্ঘ্য নির্ধারণের এই সহজবোধ্য মোটাদাগের বিবরণ থেকে বাংলা বছর মাস গণনা পদ্ধতি ও বাংলাদেশের নতুন প্রচলিত পদ্ধতির প্রকৃতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ হবে আশা করি।

# এই তো সময়

উদীচীর কর্মীদের অভিনন্দন

এই তো সময়
গা ঝাড়া দিয়ে, বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর
না, শুধু দাঁড়ানোর নয়
রুখে  দাঁড়ানোর।
মাথার ওপর দিয়ে পনেরোটি শীত গ্যাছে,
হ্যাঁ কথাগুলি সত্যি।
ঠোঁট ফেটেছে, পাতার মতো ঝরে গেছে বন্ধুরা–
যারা ছুরি হাতে দাঁড়িয়েছিল
তাদের আস্ড়িনের নীচে এখনও সেই ছুরি–
শত্রুর দলে মিশে আছে কিছু আপনজন।
গুনগুনিয়ে বসন্ড় এসেছিলো সোনার বাংলায়।
ঝড়ের রাতে প্রভাতের প্রতীক্ষায়
প্রাণ জ্বেলেছিলো যারা,
তাঁদের কথা মনে আছে তো?
শিশির, কাদা, ঘাম, রক্ত আর অশ্রুতে পা
ভিজিয়ে যারা বিজয়ী হয়েছিলো,
তাঁদের কথা?

সোনার মেয়েকে নয়, সোনার বাংলাকে ভালবাসার
এমন বসন্ড়, পৃথিবী আর কোনোদিন দ্যাখেনি।
তোমার উপর দিয়ে শুধু শীত নয়,
পনেরোটি বসন্ড়ও তো গ্যাছে।
সবাই নুয়ে পড়েছে নিস্ড়েজ, নিস্প্রভ–
হতাশায় চোখের কালো কালি
লোভী আর ভীরু, তারা তো নুয়েই থাকে।
তোমার তো অন্য নিয়ম
তুমি তো অন্য নিয়ম,
তুমি তো বজ্রেও বাশরী শোনো–
আর বাঁশিতে বজ্রের তীক্ষ্নস্বর তুলতে পারো।

*কবি আসাদ চৌধুরী*

# ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক
# ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক

কাজী মদিনা

ষাট দশকে পূর্ব বাংলার মানুষ আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিরাধে উচ্চকিত হয়ে জানিয়েছে জীবনের দাবি বাঙালির অস্ড়িত্বের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান যখন বাজেয়াপ্ত করা হল তখন বাঙালি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান শুনলো। 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি'। বাঙালি প্রত্যক্ষ করলো হাজার বছরের আমাদের সংস্কৃতি বিপন্ন হতে চলেছে। যে সংস্কৃতি আমাদেরকে লড়তে শিখিয়েছে। সেই সংগ্রাম প্রতিরোধের সময় ১৯৬৮ সালে ২৯ শে অক্টোবর লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, প্রাজ্ঞ সংগঠক, শিল্পী সত্যেন সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। শোষিত, নিপীড়িত, জনতাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে উদীচী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বির"দ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকারে শৃঙ্খল ভাঙাঁর গান গেয়ে সমাজ ও মানুষকে উদ্দীপ্ত করাই উদীচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে চার দশক ব্যাপী উদীচী জীবনের জয়গান অবিরাম গেয়ে চলেছে।

৬৮' তে উদীচীর জন্মলগ্নে ঢাকাসহ সমগ্র দেশ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যখন উম্মাতাল ঠিক সেই প্রচ" ঝড়ের সময় দীপ্ত আলোর শিখা নিয়ে এগিয়ে এলেন সংগ্রামী নেতা সত্যেন সেন। জ্বলন্ড় আলোর শিখা ছড়িয়ে গেল দেশের এপ্রান্ড় থেকে ওপ্রান্ড়ে। আলোকিত মহীর"হ উদীচী শাখা প্রশাখা নিয়ে সংস্কৃতি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পর দার"ণ ক্রোধে জ্বলে উঠে প্রত্যয়দৃঢ় শপথে উদীচীর ভাইবোনেরা গেয়ে উঠলো, 'বাংলার কমরেড বন্ধু/ এইবার তুলে নাও হাতিয়ার'। ১৯৭০ এর নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের করাল গ্রাসে দক্ষিণ বাংলার বিশাল জনপদ যখন বিধ্বস্ড়, হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন, চারদিকে মৃতদেহের স্তুপ তখন আর্তমানবতার সেবায় ছুটে গেছে উদীচীর ভাইবোনেরা। ১৯৭১-এ নিপীড়ন, নির্যাতন আর শোষণ শাসনের বির"দ্ধে দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুর" হল, তখন অগণিত দেশবাসীর সাথে গণমুক্তির লক্ষ্যে দুর্বার বেগে এগিয়ে গেছে উদীচীর ভাইবোনেরা। একই সাথে নব সংস্কৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে টগবগে তর"ণ প্রজন্ম উদীচীর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠাগতভাবে দেশব্যাপী প্রচলিত সমাজের সংস্কৃতি বিকাশের প্রচেষ্টায় নিরন্ড়র সংগ্রাম করে চলেছে।

মানুষ নিজ সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েই মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। সমাজ যত এগিয়ে চলে সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটে। তখন দেখা যায় মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটছে। এই বিবর্তনের ধারা সঠিক পথে যেন যেতে পারে এমনই মানব ও সমাজ সংস্কৃতি গড়ে তোলাই উদীচীর কাজ। যুদ্ধ করে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু ক্ষমতালোভী লুটেরার দল বার বার তা নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে। মৌলবাদী ধর্মান্ধ চরমশক্তি সুযোগ বুঝে সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং সন্ত্রাসের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে অশান্তি আনার চেষ্টা করে। উদীচী এ সকল অপশক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য মানুষের পাশে এসে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

পাকিস্তানী হানারদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাঙালি স্বাধীন দেশ পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই কুচক্রীরা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক অভ্যুত্থান আর গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান আবার এদেশের মানুষের জীবন অনিশ্চিতের পথে ঠেলে দেয়। সেই সময় উদীচী যে কাজটি করেছে তা অনন্য। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রথম প্রতিবাদী হয় উদীচী। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গান গেয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে। কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা, পবিত্র সংবিধান পরিবর্তন ইত্যাদির বিরুদ্ধে উদীচী এক দু:সাহসী প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে আসে। সৃষ্টি করে ‘ইতিহাস কথা কও’। যে সৃষ্টি জনগণকে সঠিক ইতিহাসের ধারা জানিয়ে দেয়।

মানবমুক্তির এ সকল সৃষ্টিশীল কাজ পছন্দ করে না অপশক্তি। উদীচীকে ধ্বংস করার জন্য বোমা হামলা চালায় যশোরে, নেত্রকোনায়। ঝরে যায় অমূল্য তাজা প্রাণ। রামকৃষ্ণ, রতন, তপন, সন্ধ্যারানী, ইলিয়াস, বুলু, বাবুল, শাহ আলম, নূর ইসলাম- যশোরে এবং শেলী, হায়দার নেত্রকোনায় প্রাণ দেয়। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা দ্বিগুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছি তাঁদেরকে জানাই সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা ও সালাম।

জাতীয় যে কোনো সংকট এবং সমস্যা দেখা দিলে উদীচী প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ক’রে জনগণকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়। আমরা সবাই জানি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যাযজ্ঞের এবং দুই লক্ষ নারীর লাঞ্ছনার অপরাধের বিচার আজও হয়নি। অবিলম্বে যুদ্ধপরাধীদের বিচার শুরু করার জন্য উদীচী সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশ নদীর দেশ। প্রধান সবগুলো নদীই দেশের বাইরে উৎপত্তি। উজানে নদীতে বাঁধ দিলে ভাটির নদী অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে উদীচী সরকারের কাছে দাবি করেছে। সেই সাথে রপ্তানির সুযোগ রেখে সমুদ্রবক্ষে গ্যাস বণ্টক বিদেশী কোম্পানীর কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে

তোলার জন্য উদীচী সচেতন জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গার গান গেয়ে নিপীড়িত শোষিত মানুষকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে সত্যেন সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। সেই থেকে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সংগ্রাম করে চলেছে নিরন্ড়র।

আজ আমরা দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক স্রোতধারা মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সমাজকে করছে তমসাচ্ছন্ন। দুর্নীতি, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আমাদেরকে করছে দ্বিধান্বিত। ধীরে ধীরে দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেমের মতো সুকুমার মনোবৃত্তি হচ্ছে অপসারিত। কিন্তু আমাদের আছে সমৃদ্ধ, স্নিগ্ধ বলিষ্ঠ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যা আমাদেরকে দিয়েছে জীবনবোধের চৈতন্য। আমাদের সংস্কৃতি দু:শাসনের বির"দ্ধে লড়তে সাহস জুগিয়েছে। তাই যে কোন বাঁধা এলে আমরা অতিক্রম করতে পারি আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সাহসে ও গৌরবে।

সত্যেন সেনের আদর্শে লালিত উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী মনে করে মানুষের মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি আর আত্মাকে এক করে দেখতে পারলে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। আমরা জানি সংস্কৃতিবান মানুষ নিজের চিন্ড়া, চেতনা, ভাবনা, কল্পনা এবং ভালোবাসাকে একত্রিত করে যখন জীবনের ও মনুষত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় তখনই যে কোনো আগ্রাসন মোকাবেলা করা সহজতর হয়। তাই আমরা বিশ্বাস করি সকল শুভ, কল্যাণকর ও মঙ্গলময় কাজ সম্পন্ন করা তখুনি সম্ভব যখন একজন মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে বিশ্বের মাঝে মেলে ধরতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা 'মুক্ত করা হে সবার সাথে/ মুক্ত কর হে বন্ধু'। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী উদাত্ত আহ্বান জানায় সবাইকে–আসুন আমরা সবার সাথে যুক্ত হই। এই বিশ্ব সংসারের মধ্য থেকে অসংখ্য অনুভূতির বিচিত্র রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার উপাদান চয়ন করে গড়ে তুলি বাঙালির বিপুল ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের সৃষ্টিশীল উপাদানে সমৃদ্ধ জীবন চেতনা।

আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা এবং সাাহিত্য গৌরবম"িত করার জন্য '৬৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ড় উদীচীর পতাকাতলে একত্রে জোট বেঁধে যারা কাজ করে চলেছেন নিরন্ড়র তাদের সবাইকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমূখ মনীষীদের যাঁরা আমাদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। আমরা সমস্বরে বলতে চাই–

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক
ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক

# উদীচী : এক আলোকবর্তিকা

এ এন রাশেদা

এ বছর উদীচী অতিক্রম করছে তার গৌরবের ৪০ বছর। ৪০ বছর ধরে উদীচী হেঁটেছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, গেয়েছে গণমানুষের গান, অংশ নিয়েছে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। '৭৫-এর পর গর্জে উঠেছে 'ইতিহাস কথা কও' গীতিনাট্যের মধ্য দিয়ে, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এবং এযাবৎ সব আন্দোলন-সংগ্রামে। দেশের এ সংকটকালে ২৯ অক্টোবর উদীচীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এত হতাশার মধ্যে আশা জাগায় যখন '৭১-এর স্বপ্ন বাস্ড়বায়নের লড়াইয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ কেউ মূল্যায়ন করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তেমনি একজনের একটি আশাবাদের কথা আজ আপনাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির সুস্থ ও শুভ চেতনার একটি বাতিঘর'। ২৬ জুলাই ২০০৮ দৈনিক সমকালে সম্পাদকীয় ও মন্ড়ব্য প্রতিবেদনে বিশিষ্ট কলামিস্ট এবং এবং 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বিখ্যাত সেই গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মন্ড়ব্য করেছেন উদীচীকে উদ্দেশ্য করে। তাঁর লেখা থেকেই আমি একটু উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, আমি বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীকে বলি বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির একটি অনির্বাণ বাতিঘর। এ রকম বাতিঘর আরো দুএকটি আছে। তাদের অবদানকে আমি খাটো করে দেখি না। যেমন ছায়ানট। এটিও বাংলাদেশের মানুষের একটি অহঙ্কার ও গৌরব করার মতো প্রতিষ্ঠান। তবে তিনি বলেছেন, উদীচীর অবস্থান এদিক থেকে একটু ভিন্ন। উদীচী ছড়িয়ে আছে শুধু বাংলাদেশ নয় বলতে গেলে ছড়িয়ে আছে বিশ্বের বহু দেশে। সারাবিশ্বেই উদীচীর শাখা-প্রশাখার অন্ড় নেই। এ যেন সত্যিই বিশাল বিশ্বে বাঙালির ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতির অসংখ্য অনির্বান বাতিঘর। এই বাতিঘর না থাকলে কী হতো, সে প্রসঙ্গে তিনি বলছেন; এ বাতিঘর না থাকলে স্বদেশে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালি ও তাদের নবপ্রজন্ম অকুল সমুদ্রে পথের দিশা পেত না এবং তাদের মাতৃভূমি ও মাতৃসংস্কৃতির শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক শিকড়হীন উপজাতিতে পরিণত হওয়ার পথে এগুতো। তিনি আরো বলেছেন উদীচী একটি আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালখুশিতে তৈরি হওয়া সংগঠন নয়। গোটা উপমহাদেশের গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের কয়েক দশকের স্রোত ও ঐতিহ্য থেকে উদীচীর জন্ম। অবিভক্ত ভারতে ছিল ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট, প্রগতি লেখক সংঘ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি। নানা সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। উদীচী নামটির মধ্যেই রয়েছে উত্তরাকাশের ধ্রুবতারার আলোর অন্বেষা। এই নামকরণের মধ্যে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সত্যেন সেনের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি বলেছেন কেবল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা নয়, বাংলাদেশের সংগ্রামী গণসংস্কৃতির নিভু নিভু আলোর প্রদীপই তিনি ও তাঁর সহযোগীরা আবার জ্বালিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সবার ঘরে ঘরে এবং তা জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। তিনি উদীচীর সাফল্যের কথা বলেছেন এভাবে-উদীচীর সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, প্রগতিশীল রাজনীতিভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও দেশের তরুণ প্রজন্মের একটা বড় সৃষ্টিশীল অংশকে সে মুক্তচিন্তা ও মননের দিকে টেনে আনতে পেরেছে এবং পেরেছে ধরে রাখতে। প্রতিবিপণ্ডবী ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারা উগ্র মৌলবাদের সহযোগী শক্তি হিসেবে আজ বাংলাদেশের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করতে চাইলেও তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে উদীচী, ছায়ানট, ঋষিজ প্রভৃতি সংগঠন যে শক্তিশালী দুর্গ খাড়া রেখেছে, তাকে ভাঙ্গা কোনোক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি উদীচী ও ছায়ানটের অনুষ্ঠানের বোমা হামলা চালিয়ে, তাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী ও সমর্থককে হত্যা করেও বাঙালির গণ'সংস্কৃতির এই অপরাজেয় দুর্গ ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। শ্রদ্ধেয় গাফফার চৌধুরীর এই মূল্যবান বক্তব্যের সঙ্গে আর একটু যোগ করা যায়, তাহলো মেহনতি ও শোষিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উদীচীর ভালোবাসা। উদীচীর জন্ম হয়েছিল আটষট্টির গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনে– যখন বাংলার মানুষ ফুঁসে উঠেছিল শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তদানীন্তন পাকিস্তানে বোধকরি প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই দলটির। সাহিত্যিক-শিল্পী সত্যেন সেনের হাতে গড়া সংগঠনটি আজ শতশাখায় বিকশিত হয়েছে। অতিক্রম করেছে আজ গৌরবের ৪০টি বছর। কিন্তু এই গৌরবের কথা স্মরণ করে উদীচীর উৎফুলণ্ড হওয়ার কিছুই নেই। 'শকুনীরা আজ ফেলছে বিষাক্ত নিশ্বাস। সদ্য টিআইবির রিপোর্টে যেমন প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তির প্রবণতা বেড়েছে-১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসা ধারায় এবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.৮৭ শতাংশ। এটি যে মূল্যবোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি প্রজন্ম তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ ধারা ইতিমধ্যে বেগবান হয়েছে তার প্রমাণ তারা রেখেছে। বণ্ডাসফেমি আইনের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের সমর্থন আদায়ে। শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীকে আওয়ামী লীগ কর্তৃকই ২২ জানুয়ারী ২০০৭ এর নির্বাচনে নমিনেশন দান থেকে বর্তমানে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচায়ক 'অচিন পাখি' ভাস্কর্য অপসারণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে গৃহীত ভিসির কার্যালয় নজিরবিহীন ভাংচুরের ঘটনাসহ বহু ঘটনায়। তাই উদীচীর সামনে আজ চ্যালেঞ্জ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষকে যেমন জাগিয়ে তোলা তেমনি উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর হাত থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে মানবতাবাদী

চেতনার মানুষকে সমৃদ্ধ  করে তোলা। তবেই সার্থক হবে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখের শ্রমসাধানা। কামনা করছি উদীচী বর্তমানের, নৈরাশ্যের দেয়াল ভেঙে '৭১ এর চেতনায় দেশকে গড়ে তুলতে সাংস্কৃতিক কর্মধারাকে আরো বেগবান করবে। প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি গ্রামে উদীচীর শাখা গড়ে তুলবে। জয়তু সত্যেন সেন, জয়তু রণেশ দাশগুপ্ত, জয়তু উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

# সত্যেন সেন, উদীচী ও বাংলাদেশ

মতলুব আলী

সারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে চারটি দশক সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে থাকা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত দেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সংগঠন  উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কথা এলেই অনিবার্যভাবে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রতিথযশা সাংবাদিক, জীবনবাদী লেখক ও কথাশিল্পী সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) কথা আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন একজন প্রগতিবাদী বিষয়ে চিন্তাবিদ, ঔপন্যাসিক ও বিপ- বী সংগঠক। তাঁর সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীয় পরিচয় ছিল এই যে, তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের সংস্কৃতিসেবী। আর আক্ষরিক অর্থেই তা সত্য ছিল এ জন্য যে তিনি গান লিখতেন, নিজের সুরে গাইতেন। সর্বোপরি অন্যদের শেখানোর মধ্য দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন সে গান সাধারণ্যে গেয়ে শুনিয়ে জনমানুষের মনকে উদ্দীপ্ত করার জন্য। উদীচীর উদ্ভব ঘটেছিল তাঁর ওই সঙ্গীত সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিগত কর্মসংশি- ষ্ট ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাচেতনা উৎসাহিত দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের পরিপূরক কর্মপদক্ষেপ হিসাবে।

এ বিষয়ে সমাজ সচেতন পণ্ডিতদের মতদ্বৈততা থাকার কথা নয় যে, সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক অর্থে পরিশীলন ও বিশুদ্ধতার নাগাল ছুঁয়ে তারই সঙ্গে আমাদের সমন্বিত করা এবং সেই প্রক্রিয়া যাতে স্থায়ীরূপে পর্যবসিত হয়ে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করা। সত্যেন সেন তাঁর জীবনে গতিপথ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এমন প্রমাণ রেখেছিলেন যা সংস্কৃতি সম্পর্কিত ওই জাতীয় ধ্যান ধারার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েও স্বতন্ত্র, যা কিনা একটুখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানো তার ভিন্নপথের অনুসারী চিন্তার দিকে মনোযোগ ফিরিয়েছিল আমাদের। আজ থেকে চলিণ্টশ বছর আগে ১৯৬৮-তে যখন উদীচী প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই ভিত্তি স্থাপনকালের বিচিত্র ঘটনাবলীই সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত চিন্তাধারার। মানুষের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার ব্রত নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সমাজগঠনমূলক কাজে। নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তাঁর কর্মময় জীবনের শুরু হলেও এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একাধিককবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে সর্বমোট সাত বছর জেল খাটলেও, তার সমধিক পরিচিতি ছিল একজন স্বনামধন্য কথাশিল্পী হিসাবে। এই সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে বা একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা ও সফল সংগঠক হিসাবেও তার ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর সংস্কৃতি চেতনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের দিকে চেয়ে তাদের স্বার্থসংশিণ্টষ্ট বিনোদনভিত্তিক চিন্তাধারা কেন্দ্রিক ছিল না, বরং ছিল একবারেই সাধারণ নিম্নস্তরের মানুষের জীবন ও

তাদেরই ভাবনা সম্পৃক্ত। সত্যেন সেন সমাজ-সচেতন মানুষ ছিলেন। বৃহত্তর মানব সমাজ তথা মানব জাতির ভালমন্দ নিয়ে তার ভাবনার অন্ত ছিল না।

মানব জাতির উদ্ভব ও বিকাশের অগ্রগতির ইতিহাস কিংবা শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের দিকগুলো সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট। আর সে ব্যাপারে তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন। জংলি, শিকার-অন্বেষী আদিম মানব জাতি অসভ্য আর বর্বর অবস্থা কাটিয়ে সুশৃঙ্খল জীবনের লক্ষ্যে একদিন সভ্যতার খসড়া রচনা করেছিল। আর তারই ফলস্বরূপ আজ সভ্যজগতের মানুষ আমরা সভ্যতার এই ধাপে ধাপে উন্নতি আর এর জন্য মানুষের যে সাধনা বা প্রচেষ্টা তাই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। এ এমন এক জটিল কার্যধারা যা মানুষের সমাজের অগ্রগতি ও ঐতিহ্যের ধরণ এবং কোন জাতি বা সাম্রাজ্যের প্রকৃতি নির্দেশক গুণ। এককথায়, সংস্কৃতি হচ্ছে সেই সুস্পষ্ট ধারণার অনুকূল এক সত্য, যা সামগ্রিক অর্থে মানব উন্নয়নের পরিপূরক। এ সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণার পাশাপাশি সত্যেন সেনের চিন্তায় ছায়া ফেলেছিল আরেকটি বিষয় যে, গাঁও-গেরামের সাধারণ মানুষকে সংস্কৃতির ধারায় শামিল করতে হলে অবশ্যই এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যার মধ্য দিয়ে তাদের মনে আশার আলো জাগবে। আর ওই ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশাল প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনীও গড়ে উঠবে, যারা মানুষ এবং মানব সমাজ তথা দেশ ও মাটির প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর জনমানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে সজাগ থাকবে। সাধারণ অর্থের সংস্কৃতিসেবী কিংবা সংস্কৃতিকর্মীর সঙ্গে সমাজ সচেতন প্রগতিবাদী সংস্কৃতিকামী বা চর্চাবিদের চিন্তাভাবনা ও কর্মপ্রক্রিয়ায় যথেষ্ট ফারাক রয়েছে, যা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বিষয়টি আমরা সঠিকভাবে সব সময় অনুধাবন করতে পারিনি বা পারি না এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের সচেতনতার মাত্রা সম্পর্কে আমরা খুব একটা সতর্ক নই বলে ওই অসতর্কতার মধ্য থেকেই আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিবোধজনিত ঘাটতি রয়ে যায়। সে রকম অসম্পূর্ণতা না থাকলে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির টানাপোড়েন ও ব্যবসাদারি সংস্কৃতিক ডামাডোলে পড়ে আমাদের অস্তিত্ব খুইয়ে হারিয়ে যেতে হতো না আর তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রাচুর্য সম্পদ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যে নিয়মনিষ্ঠার পরিচর্যাসহ সামগ্রিক যত্নআত্মির প্রয়োজন ছিল তার কোন নিশ্চয়তা থাকেনি। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক গতিপ্রবাহও আজ বিচিত্রপথে ধাবমান এবং যে পথের অনেকাংশই আজ অসংস্কৃতি এবং আকাশ-সংস্কৃতির ধ্বজা উড্ডীন রাখার দিকে ধাবিত। সেই অবক্ষীয় পথ থেকে এবং তার অবরুদ্ধতার আওতা থেকে বা ওই দুর্বিষহ আপদজনক পরিস্থিতির পাশ কাটিয়ে সার্বিক অর্থে সেখান থেকে মুক্ত হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণ কব্জা করার সত্যিই আজ আর কোন সহজ রাস্তা খোলা আছে বলে মনে করি না। কারণ গুনগত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সমকালে সাংস্কৃতিক পটভূমিটাই গণবিমুখ ও লোক-ঐতিহ্যবিমুখ এমন কদাকার রূপ ধারণ করেছে যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করাটা ব্যর্থ শ্রমেরই

শামিল হবে, তার বেশি কিছু হবে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু তাই বলে প্রগতির পথসন্ধানী মানুষ তো হা-পিত্যেশ করে নির্লিপ্ত বসে থাকতে পারে না। তাদের তো একটা স্থির লক্ষ্য আছে। মানুষের এই পৃথিবীকে তারা সামাজিক কলুষতার গণ্ডানি থেকে বাঁচাতে চায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকিত পথে এখনও সে ধাবমান। উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন শক্তিমান গণসঙ্গীতস্রষ্টা ও কথাসাহিত্যিক সত্যেন সেন। আর প্রথম সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন তরুণ সাংস্কৃতিক সংগঠক মোস্তফা ওয়াহিদ খান। এই সঙ্গে স্মর্তব্য প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রগতিবাদী লেখক রণেশ দাশগুপ্তের নাম। তিনি তৈরি করেছিলেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রথম গঠনতন্ত্র। তাঁরা কেউই আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত এবং বহু কর্মী-সংগঠক ও বিদগ্ধ গুণীজনের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানে সমৃদ্ধ সেই সংগঠন নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজও অঙ্গীকারের দৃঢ়তায় গতিশীল চলিষ্ণু অস্তিত্বে বিরাজমান। আধুনিক যুগের মানুষ সচেতনভাবেই তার নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তিত এবং উন্নত করার জন্য সদাসচেষ্ট। প্রয়োজনীয় চাহিদার আবিস্কার করে তার অভাব পূরণ করে যাবতীয় পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিষয়টি তার সেই অব্যাহত কর্মপ্রচেষ্টারই অংশ। সেদিক থেকে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে মানুষের সামাজিক প্রচেষ্টারই নামান্তর। সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে শিক্ষা, মার্জিত রুচি বা স্বভাব-আচরণের উৎকর্ষ আমরা বুঝি, যা আপরিণত ও অমার্জিতের পুরোপুরি বিপরীত। আবার সুস্পষ্টভাবে বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধীয় সাহিত্য-সঙ্গীত শিল্প এবং দর্শন প্রভৃতিকে বোঝানোর জন্যও সংস্কৃতি একটি যুতসই শব্দ। সমাজের একজন সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভ্যাসের সামগ্রিক রূপটিই সংস্কৃতি। আপেক্ষিক অর্থে সংস্কৃতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর মধ্যমরূপে আমাদেরকে আমাদের পরিপূর্ণ মানব জীবনাচরণের অনুকূলে মানবিক মূল্যবোধের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আর সমাজের মানুষ কোন একটি বিশেষ লক্ষণীয় স্তরে সচেতনভাবে উন্নীত হওয়ার জন্য যে সমস্ত ইতিবাচক কাজে নিয়োজিত হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের সমৃদ্ধি বিষয়ক চিন্তাভাবনার যে চর্চা: সংস্কৃতি মূলত সেই দিকগুলোকেই নিজেদের কর্মকাণ্ডেরই আওতাভুক্ত করে নিয়েছে অংশ। যে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে নেয়ার কথা, জীবযাত্রার মান উন্নয়নের কথা এবং মানব জীবনাচরণের অনুকূলে মানবিক মূল্যবোধের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্পর্কিত সম্ভাবনার কথা।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্যকেন্দ্র হচ্ছে মানুষ ও তার জীবন সংগ্রাম। কারণ উদীচী জানে এবং মানে সমাজ ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতি যা গড়ে সমাজ তাই। সভ্যতা আমাদের কীর্তি, সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের পরিচয়। তার মানে আমরা 'যা' তাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। উপরন্তু সংস্কৃতি হচ্ছে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক

উভয় দিক থেকেই ধারণ করা যেতে পারে সর্বতোভাবে এমন একটি মানব-নিয়ন্ত্রিত, ক্রিয়াশীল সামাজিক আয়োজন ও গতিশীল উপচার, যা মানব উন্নয়নের পথে দিকনির্দেশক এবং সূচকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব দিকের সুচিন্ড়িত বিবেচনায় মানুষের জীবন-সংগ্রামের আলোকিত পথ ধরে উদীচী তার কর্মপরিধিকে বিস্তৃত করেছে গণসাংস্কৃতিক চেতনা থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে সংস্কৃতির সংগ্রাম পর্যন্ড়। ঐতিহ্যনুগ মৃত্তিকা-সংলগ্ন লোকায়তিক কর্মাঙ্গন এবং মানবিক সত্তার গভীর প্রদেশে প্রবেশের পথ খোলা রয়েছে তাদের সামনে। মাটি ও মানুষের সেই আহ্বান উপেক্ষা করার জো তাদের নেই। বৃহত্তর মানব-সমাজের এ আহ্বান, সংস্কৃতির সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার মোক্ষম পথ এখনও একমাত্র এটাই। এর কোন বিকল্প সন্ধান মহানগর-বন্দরের রাজপথে নেই। বাধা বিপত্তি এসেছে, উদীচীকর্মীরা বার বার বোমা হামলার শিকার হয়েছে, তবু মৃত্যুভয়ে ভীত হয়নি। পথনাটক-মঞ্চ নাটকের প্রতিবাদী মঞ্চায়নে মেতেছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, নগরে-বন্দরে। সংস্কৃতিকর্মী নারীকর্মীরা ছুটে গেছে দিনের পর দিন কলে-কারখানায় শ্রমিক-দিনমুজরদের কাছে, ক্ষেতে-খামারে কৃষক-চাষীদের মধ্যে উঠানে। শহীদ মিনারে, মিছিলে-মিটিংয়ে জনতার কাতারে মিশে জনপথে-প্রান্ড়রে, মেঠোপথ-জনপদে ছড়িয়ে গেছে তারা। চলিণ্ডশ বছর ধরে পরিচালিত উদীচী এ সংস্কৃতির সংগ্রাম আজও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলার গানে গানে চেতনার পথে চলা উদীচীকে শুভেচ্ছা।

# উদীচী

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে উদীচী'র চলিণ্ঢশ বছর পথ চলা পূর্ণ হল। সময় থেমে থাকেনা, উদীচীও থেমে থাকেনি। চলিণ্ঢশ বছরে ডাল পালা শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আজ বিরাট এক মহীর"হে পরিণত হয়েছে। পাঁচজন সমমনা প্রত্যয়দীপ্ত তর"ণ একত্রিত হলে তারা গড়ে তুলছেন উদীচী'র একটি শাখা, সে গ্রাম গঞ্জে, উপজেলা কিম্বা জেলা যেখানেই হোক না কেন। লণ্ঠন জ্বালিয়ে মাটির ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সমবেত কণ্ঠে গাইছেন সমাজ বদলের গান। আড়ম্বর নেই, আন"ড়রিকতা আছে। জৌলুস আর চাকচিক্যের বাহারি শোভা ছড়ানো নয়, স্বাধীনতার দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পর আজও সমাজে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক কুসংস্কার, রাজনৈতিক অবদমন মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে রেখেছে সেইসব দুস্থ, নিঃস্ব, খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই আদর্শ আর প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ-হৃদয় উদীচী'র কর্মীরা। পাপ আর পঙ্কিলতায় পচে যাওয়া এই সমাজে উদীচী জ্বালিয়ে রেখেছে একটি আলোর শিখা।

ক্ষীণ দৃষ্টি, শীর্ণ শরীরের একজন মানুষ যার জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে কারা অভ্যন"ড়রে, মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরও তিনি ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন বিশাল সংখ্যক মানুষের চেতনা আর বোধে। এখনো তাঁর নামে সুবাতাস বয়, তাঁর স্মৃতি কথা বলে মানুষের হৃদয়ে, তাঁর লেখা আর জীবনচর্যায় যে আদর্শ, ত্যাগ আর জীবনবোধের প্রতিফলন আজও তা মানুষকে মহৎ বোধে উদ্বুদ্ধ করে।

সত্যেন সেন বিপণ্ঢবী, মার্কসবাদী, লেখক, সংগঠক, রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। ভগ্ন শরীরেও ক্লান্ড়িহীন কর্মি। সমগ্র জীবন, কর্ম, শ্রম তিনি নিয়োজিত করেছিলেন সৃষ্টির কাজে। তার"ণ্যের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন সমাজ পরিবর্তনের কাজে। কখনো সাহিত্যচক্র গড়ে, কখনো গানের দল গড়ে। তাঁর সম্পর্কে গোলাম মোহাম্মদ ইদু লিখেছেন 'সত্যেন দা যে–আদর্শ বিশ্বাস করতেন সেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্ড়বায়নে তিনি তাঁর জীবন–যৌবন, ধনসম্পত্তি সবই বিলিয়ে গেছেন। তিনি শুধু লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি, সমাজ বদলের মহান কর্মকা"ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন। শ্রমিক-কৃষক, শহরের বস্ড়িবাসী গরীব, ছাত্র ও জনতার কিম্বা শিল্পীদের মিছিলে তিনি অসংকোচে ফেস্টুন ধরেছেন, গলা মিলিয়ে রাস্ড়ায় গান ধরেছেন।"

'সবার উপরে মানুষ সত্য'–চৈতন্য দেব অনেক আগেই একথা বলেছিলেন। সত্যেন সেনও একই কথা বললেন–মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। এই মানুষই দেশে দেশে

শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত হচ্ছে। দুর্বলের ওপর চলছে সবলের অত্যাচার। নিঃবিত্ত খেটে খাওয়া এই সব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সচেতন করতে হবে তাদের অধিকার সম্বন্ধে। দুর্বল এই সব মানুষ জানে শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে হবে তাদের। সুচারুরূপে পরিশীলিত, অভিজাতের সংস্কৃতি নয়, গণমানুষের সংস্কৃতি। এই উদ্দেশ্য আর আদর্শ সামনে রেখেই উদীচী'র প্রতিষ্ঠা। সমাজ বাস্তবতার এই সত্যকে উপলব্ধি করেই সত্যেন সেন গড়ে তুলেছিলেন উদীচীর মত সংগঠন।

সময় বদলে গেছে। সমাজও। শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। চলিণ্চশ বছর একটি সংগঠন প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিবিরোধী রাজনৈতিক অবদমনের মধ্যেও সদর্পে টিকে রইল তার পেছনের চালিকা শক্তিটি কি এ প্রশ্ন যদি করা হয় এক কথায় তার উত্তর হল উদীচী কর্মিদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, প্রগতির পক্ষে থাকা, মানুষের কথা বলা, মানুষকে নিয়ে পথ চলা। উদীচী সেই আদর্শকে আজও ধরে রেখেছে। উদীচী সংগীত, নাটক, আবৃত্তি–সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে অবিরাম কাজ করে চলা একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। সে কারণেই বারবার মূর্খ মৌলবাদী আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে তাকে। কত গুণী শিল্পী, নিরীহ কর্মি মৌলবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে, বোমার আঘাতে পঙ্গু হয়ে কতজন জীবনম্মৃত অবস্থায় আজও অসহায় জীবন কাটাচ্ছে কেউ তাদের খবর রাখেনি। উদীচী কর্মিরাই তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সীমিত সাধ্য সহায় সম্বল নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। মৌলবাদীরা চায় সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করে দিতে। তারা চায় বাঙালির হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে ধর্মীয় অনুশাসনের গোঁড়ামিতে দেশের মানুষকে বদ্ধ করে ফেলতে, তারা চায় নারীকে অবরোধবাসিনী করে গৃহকোণে বন্দী করে রাখতে, সভ্যতার অগ্রযাত্রার গতিকে রুদ্ধ করে দিতে। উদীচী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদই শুধু করে না, প্রতিরোধও গড়ে তোলে। উদীচীর হাতে মৌলবাদীদের মতো আগ্নেয়াস্ত্র নেই, কিন্তু তার থেকেও শক্তিশালী অস্ত্র তার আছে। আছে মানুষ আর মানুষের সংস্কৃতি। সমবেত মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি পারে যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গ, বাধার অচলায়তন ভেঙে গুড়িয়ে দিতে। ফ্রান্সে বাস্তিলের পতন হয়েছিল, একাত্তরে ভেঙে পড়েছিল স্বৈরাচারী শাসকের সিংহাসন। স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িক শক্তি বিদায় নিলেও আজও মানুষ শোষিত হচ্ছে, শাসিত হচ্ছে দেশীয় প্রভূদের দ্বারা, বিশেষ করে সেই সব মানুষ যারা নিজেরা অভূক্ত, অর্ধাহারে থেকে দেশের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের দুর্ভাগা এই দেশে এই সব মানুষেরাই আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সব মানুষের কথা ভেবে, এই সব মানুষকে নিয়ে সত্যেন সেন গড়ে তুলেছিলেন উদীচী।

উদীচী'র দীর্ঘ এই পথ চলায় তার গায়ে কি লাগেনি কোন ঝড়ের আঁচড়। চলার পথ শুধু মসৃণ হবে একথা ভেবেতো উদীচী'র জন্ম হয়নি। সত্যের পথে চলা কখনো

সহজ হয় না। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া/ দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো মদন্তি।" কঠোপনিষদের এই আপ্তবাক্য সত্যেন সেন নিশ্চয় জানতেন। আজ তিনি নেই। আমরা কি সরে আসিনি তাঁর দেখানো পথ থেকে? তাঁর জীবন, কর্ম থেকে কতটুকু শিক্ষা আমরা নিতে পেরেছি! মনের ভেতর আদর্শ পুষে রেখে নিষ্ক্রিতায় আচ্ছন্ন থাকা কোন কাজের কথা নয়। উদীচীর মধ্যে উদীচী'র আদর্শ ধরে রাখা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। নেতৃত্বের লোভ, কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রায়শই ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে উদীচী। কোথাও কোথাও উদীচীকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে। আদর্শহীন, মনুষ্যত্বহীন লোভ আর লালসায় ডুবে থাকা মানুষে ছেয়ে গেছে দেশ, সমাজ। উদীচীতে অনুপ্রবেশ ঘটছে তাদের। এসবের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্যই উদীচী। আগাছা উপড়ে ফেলার দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করতে হবে। বাঁচাতে হবে উদীচীকে ভাঙনের হাত থেকে।

শীর্ণ শরীর, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, আর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার সত্যেন সেনের সাথে চেহারায়, কাজে এ সময়ের যে মানুষটি খুব কাছাকাছি আসেন তিনি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। দুজনে নিকট আত্মিয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত। একজন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ–যুক্ত করেছেন নিজেকে, আত্মনিয়োগ করেছেন দেশ ও জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। অমর্ত্য সেনকে তার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য হয়তো তাঁর পূর্বসূরীর মতো অতটা প্রতিবন্ধকতার পাঁচিল পেরোতে হয়নি। তিনি তার পরের প্রজন্ম। কিন্তু একই লক্ষ্যে কাজ করেছেন দুজনেই। অমর্ত্য সেনের গবেষণার বিষয়বস্তুতো দারিদ্র্য বিমোচনের অর্থনীতি। পূঁজির সংজ্ঞা দিলেন তিনি, পুঁজি = শ্রম+ঋণ। অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান আর অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'প্রতীচী', যে প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নোবেল জয়ের অর্থ দিয়েই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বভারতী যা আজও সমগ্র বিশ্বকে আকর্ষণ এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তগুলিকে আমরা আবর্জনার ঝুঁড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ছাব্বিশ বছর আমি কেন আছি উদীচীর সাথে এ প্রশ্ন নিজেকে করেছি। মফস্বল শহরের আমার মতো সাদামাটা অখ্যাত একজন মানুষের উদীচী'র সাথে থাকা না থাকায় উদীচী'র কিছু এসে যায় না। উদীচী আমাকে কি দিয়েছে তার আগে আমি কি করতে পেরেছি উদীচী'র জন্য সে প্রশ্নটা সামনে এসেছে। উদীচী এমন কোন উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি চর্চা করেনা যা আমার মনোজগতকে আলোকিত করতে পারে। শুধু একটি পদ আঁকড়ে থাকার জন্যও উদীচী নয়। আমি দেখি সারি সারি উজ্জ্বল তরুণ মুখের মিছিল, কেউ থাকছে, অনেকেই আবার চলে যাচ্ছে। বুঝে না বুঝে, কিছু করতে না পারলেও উদীচী'র কর্মিরা পথে দাঁড়িয়ে অন্তত একটা মানববন্ধন করে দেশে ঘটে যাওয়া অপকর্মের প্রতিবাদ জানাবার সাহস রাখে। উদীচীর কর্মিরা ছুটে যায় দুর্গত, দুস্থ মানুষের পাশে, সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের

দিকে। কিছুদিন আগে আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনার দাকোপ থানার নিরাশ্রয়, নিরন্ন ভেড়ি বাঁধে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার মানুষের জন্য সাহায্য সামগ্রী নিয়ে তারা ছুটে গেছে একাধিকবার। এই দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী এবং শিশুরা। ঘর নেই, উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসবাস, শৌচাগারের প্রশ্নই ওঠে না। নারীদের দুর্ভোগের সীমা পরিসীমা নেই। কোন পরিবহন নেই। আইলায় সব বিপর্যস্ড়। উদীচী' কর্মীরা পথচারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে অস্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ সামগ্রী কিনে নিয়ে গেছে দাকোপে। যে শৌচাগার তারা নির্মাণ করে দিয়ে এসেছে তাতে তাদের আগামী একবছরের প্রয়োজন মিটে যাবে। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ড় উদীচী কর্মি তারক চন্দ্র কুুর বিদেশে চিকিৎসার আংশিখ ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেছে উদীচী'র কর্মিরা। তারক এখন সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। যোগ দিয়েছে উদীচী'র কর্মকাে। সাংস্কৃতিক কর্মকাের সাথে চলে এমনই মানবিক সেবামূলক কর্মকা। উদীচী আলো দেয়, পথ দেখায়, সঠিক গন্ড়ব্যে পৌঁছানোল দিক নির্দেশনা দেয়।

উদীচীতে আসা এইসব তর"ণের দল, আমি তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে। এইসব উজ্জ্বল তর"ণের প্রত্যয়দীপ্ত মুখ আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা কর্মকা দেখতে দেখতে আশা আর অপেক্ষায় থাকি সেদিনের যেদিন এদের মধ্যে থেকেই একজন সত্যেন সেন তৈরি হবে, আগামীর আলোকিত ইতিহাস তৈরি করবে। আমরা যা পারলাম না তারা সেটা করে আমাদের ব্যর্থতার ব্যাথাভার কিছুটা হলেও মুক্ত করতে পারবে।

# উদীচীর পথ ধরে

রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা

উদীচীতে কাজ করতে আসাটা কোনো পরিকল্পনার অংশ ছিল না। তখন ছাত্র ইউনিয়নে কাজ করি। ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সময় একটি সাংস্কৃতিক দল গড়ে তোলার কাজে আমি ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলাম। ১৯৮১ সাল থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সংস্কৃতি কর্মীদের সমন্বয়ে ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতি দল গড়ে ওঠে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই সাংস্কৃতিক দল ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সে সময় ডাকসুর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল থাকলেও স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের প্রথম দিকে এই দলের তেমন কোনো উলেণ্টখযোগ্য ভূমিকা ছিল না।

১৯৮৪ বা ১৯৮৫ সালে উদীচীর  কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্ড়াব গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলন সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য তখন নতুন কর্মী সংগঠক সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সাংস্কৃতিক কর্মকাে র সাথে যুক্ত ছিলাম বলে আমাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমি, সানাউলণ্টাহ লাভলু, মামুন রশিদ, হার ন অর রশিদ, আনিস উদ্দিন ইকবাল রাফু সহ সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি বড় দল উদীচীর সাথে যুক্ত হয়। সে সময়ে এই নতুন কর্মীদের কাজে লাগানোর জন্য প্রয়াত নেতা মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান, আনোয়ার হোসেন, সেন্টু রায়, অপূর্ব জ্যোতিনাথ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন।

উদীচীতে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি যে সব বিষয় থেকে প্রেরণা পেয়েছি তা হলো এর দর্শন। ছাত্রজীবনে গণমানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রতি যে কর্তব্যবোধ ও অঙ্গীকার তৈরি হয়েছিল উদীচীর মাধ্যমে তা  বাস্ড়বায়নের যেন একটি পথের সন্ধান আমরা পেলাম। ছাত্র জীবনের যবনিকা টানতে টানতেই তাই যুক্ত হয়ে গেলাম উদীচীর সাথে, ব্যাপকভাবে।

এরশাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এক শক্তি। যে শক্তির পুরোটাই আমরা নিয়োজিত করেছিলাম উদীচীর কাজে। উদীচীকে সংগঠনগতভাবে শক্তিশালী করা, উদীচীর সাংস্কৃতিক কর্মকাে  বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখার সকল কাজ সমান্ড়রালভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এই সময়ে উদীচীর শাখার সংখ্যা ২০০ অতিক্রম

করে। উদীচীতে আবৃত্তির দল গড়ে ওঠে। মঞ্চ নাটকের দল সুসংগঠিত হয়ে মহিলা সমিতিতে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে, উদীচীর কর্মীরা সে সময় শর্ট ফিল্ম আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। সে সময়ে লোক সংস্কৃতির চর্চাও বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠিত হয় বহুসংখ্যক সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ। উদীচীর শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক দল গঠন করে বিদেশ সফর শুরু হয় এ সময়ে। উদীচীর আমন্ত্রণে বিদেশী সাংস্কৃতিক দলও সফর করেন। বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী সলিল চৌধূরী, অজিত পান্ডে, কবি অমিতাভ চক্রবর্তী সহ পশ্চিমবঙ্গের আইপিটিএ'র সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশে আসেন। উদীচীর জন্য এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মকাণ্ডে উদীচীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। কেন্দ্র থেকে সকল পর্যায়ে উদীচী পালন করেছে এক কেন্দ্রিক ভূমিকা। তাছাড়া উদীচীর কেন্দ্রীয় অফিস ব্যবহৃত হয়েছে জোটের সভা অনুষ্ঠানের জন্য এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। জোটের উদ্যোগে বিজয় উৎসব, একুশের অনুষ্ঠানমালায় উদীচীর ভূমিকা ছিল সংগঠকের। বিজয় উৎসবে শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানমালার দায়িত্ব উদীচীকেই পালন করতে হতো। অনুষ্ঠানে, রাজপথে, সংগঠনে উদীচী কর্মীদের দৃপ্ত পদচারণা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ড় উদীচীর কর্মীরা যেমন রাজপথে ছিল তেমনি অপরাপর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকেনি।

এই সময়কালে মে দিবসের ২০০ বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। উদীচী প্রেস ক্লাবের সামনে মে দিবস নিয়ে আয়োজন করে শিল্পকলা প্রদর্শনীর। ১৯৮৬ সালেই বর্নবাদবিরোধী আন্দোলনে উদীচীর কর্মীরা সঙ্গীত, নাটক আবৃত্তি নিয়ে নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

১৯৮৮ সাল থেকে উদীচী সংগঠিতভাবে লোক সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে। উদীচীর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে একটা বড় অংশ জুড়ে লোক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। ইতিহাস কথা কও, দিন বদলের পালাসহ বিভিন্ন আলেখ্য ও সংগীতে লোক সংস্কৃতির উপাদান ছিল ব্যাপকভাবে। কিন্তু এ সময়ে বিভিন্ন জেলা থেকে লোক শিল্পীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় লোক সংগীত উৎসব। প্রথমবারের মতো এই লোক সংগীত উৎসব ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিয়াল, বাউল, সংগীত শিল্পী, ঢোলবাদক, আদিবাসী শিল্পীদের সমবেত করা হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে এই অনুষ্ঠান। প্রথম উৎসবের পর ২য় ও ৩য় উৎসবের আয়োজন করা হয় ঢাকা এবং যশোরে। এই লোক শিল্পী উৎসবে প্রথম বারের মতো ঢাকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কবিয়াল রমেশ শীলের ঢোলবাদক বিনয় বাশী দাস, ফনী বড়ুয়া, মানিকগঞ্জের শিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতী, সুনামগঞ্জের আব্দুল করিম শাহ সহ আরো অনেকে। ময়মনসিংহের সালাম বাউল ছাড়াও, সারা দেশ থেকে কয়েক শত লোক শিল্পী এই উৎসবে যোগ দেন।

পরবর্তীতে বিনয় বাশী দাস, সাইদুর রহমান বয়াতী উদীচীর সাথে পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন। এই লোক উৎসবের সাংগঠনিক পর্যায়ে বর্তমান অনেক কর্মী ও নেতাদের সাথে মোফাখখারুল ইসলাম জাপান, সানাউল- াহ লাবলু, মামুন রশিদ, প্রনব সাহা লিটন. সাইফউদ্দিন আহমেদ মাহবুব, সৈয়দ শহীদ সহ আরো অনেকে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উদীচী এ সময় সংগঠিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি এই সময়ে নানা ইস্যু তুলে জনমনে বিভ্রান্ড়ি ছড়াতে থাকে। তখন উদীচী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের ধারায় অগ্রসর করে। উদীচীর শিল্পীরা সে সময়ে প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবিতা ও গানের ক্যাসেট। তাছাড়া সে সময় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালিত সারা দেশে।

এই সময় কালে উদীচীর একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছিল সত্যেন সেন রচনা সমগ্র প্রকল্প। পাঠকদের নিকট থেকে অগ্রিম অর্থ তুলে উদীচীর কর্মীরা অত্যন্ড় উন্নত মানের এই প্রকাশনা বাস্ড়বায়ন করেন। সনজিদা খাতুন, হায়াৎ মামুদ, শফি আহমেদ, বদিউর রহমান, মফিদুল হক সহ আরো অনেকেই এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্যাপক অবদান রাখেন।

এই সময়ে উদীচীর যুক্তরাজ্য শাখা গড়ে ওঠে। উদীচীর শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বিশেষত ১৩৯৯ ও ১৪০০ সালে উদীচী বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের নিয়ে বিশাল দল ভারত সফর করে। ১৪০০ সাল উপলক্ষে অন্নদাশংকর রায় এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতে এক বিশাল অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০০ জন শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পুরো দল সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে উদীচী।

আমার কাছে উদীচী একটি দর্শনের নাম। যে দর্শনে একবার কেউ যুক্ত হলে নিজেকে সেখান থেকে বিযুক্ত করতে পারে না। আমার ধারণায় উদীচী একটি আন্দোলনের নাম। যে আন্দোলন দানবের বিরুদ্ধে মানবজয়ের মন্ত্র উচ্চারণের আন্দোলন। যে আন্দোলন আমাদের মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ ঘটায় এবং সাহসিকতার উদ্বোধন করে। আমার কাছে উদীচী সংস্কৃতি চর্চার এক শুদ্ধ ক্ষেত্র। যেখানে রয়েছে সংগ্রামের গান যা অন্যায়কে প্রতিহত করার সাহস যোগায়, যেখানে রয়েছে সৃষ্টির গান যে গান আগামী দিনের সম্পন্ন সুন্দর গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখায়।

এই প্রত্যয়, এই অঙ্গীকার, এই দর্শন উদীচীর রক্তমাংসের সাথে মিশে আছে। তাই সবশেষে বলতে হয় দেশকে ভালবেসে, মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সভ্যতাকে ধারণ করে, আধুনিকতাকে স্পর্শ করে আসুন সবাই উদীচী হয়ে উঠি।

# স্বাধীনতা, সাম্য, শান্ড়ি ও মৈত্রীর এক পথিকৃত উদীচী

ফকির আলমগীর

আমার লেখাটা শুর“ করছি উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ দেশের মেহনতী মানুষের বন্ধু, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণ পুর“ষ সত্যেন সেনের একটি গানের বাণী দিয়ে,

“মানুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী
তাই দিয়ে রচি গান
মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাব
মানুষের দেয়া প্রাণ”

সেই ধারণা নিয়েই, জনসাধারণের জীবনযাত্রার সংগ্রামে তাদের সঙ্গে শরিক হওয়ার সংকল্প নিয়ে যে শিল্পীগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল তারা আজও সেই আর্দশকে সামনে রেখে কাজ করে চলছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের গান কণ্ঠে ধারণ করে ১৯৬৮ সনের ২৯ অক্টোবর বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শ্রী সত্যেন সেনের নেতৃত্বে ঢাকায় প্রষ্ঠিত হলো উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। বাংলাদেশে নবসংস্কৃতি বিশেষত গনসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা।

উদীচী একটি চেতনা সম্পন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সেই চেতনা হচেছ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঙালীর হাজার বছরের অর্জন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ভেতর দিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে। এই বিজয়ের অংশিদার আপামর বাঙালি জনগণ, উদীচী কখনই প্রান্ড়িক মানুষের স্বার্থের কথা ভোলে না। জনগণের দ্বারাই এই সংগঠনের সৃষ্টি এবং সাধারণ জনগণের চাহিদাকে পথেয় করেই উদীচী পথ চলছে। দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে, দেশের মানুষের শান্ড়ি সুখের অন্ড়রায় এবং দেশকে পশ্চাদমুখী ধর্মান্ধতার অন্ধগলিতে নিয়ে যাওয়ার অশুভ শক্তি স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের দাবি উদীচীর জন্মকালের দাবি, এ দাবি নিয়ে উদীচী নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সবার সাথে আন্দোলনে সক্রিয়।

উদীচী তার জন্মের ৪০ বছর পূর্ণ করছে এটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা তৈরি এই সংস্থা দেশের মানুষের সুখ দুঃখের সংগ্রাম শান্ড়ির ৪০ টি বছর পার করে এসেছে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণে প্রাণে মিলেমিশে এই বিষয়টি যেমন একদিকে আনন্দের অন্যদিকে উদীচীর চলিণ্ডশ বছর পূর্তির এই মূহুর্তে বেশি করে মনে পড়বে সেই মহাণ ব্যক্তিটির কথা, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে এদেশের শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন,

সাংবাদিকতা, লেখনী আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে জাগ্রত করার জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, সেই মেহনতী মানুষের কাজ সংগঠনের প্রাণপুরুষ সত্যেন সেনের কথা। একই সাথে মনে পড়বে যারা এই সংগঠনকে ভালোবেসে প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন। বিশেষ করে ৬ মার্চ ৯৯ যশোরে উদীচী ট্রাজেডি স্মরণে হৃদয় রক্তাক্ত হবে। বেদনায় ভারী হবে বাংলার আকাশ বাতাস স্বজন হারানোদের কান্না হয়ে ঝরে পড়বে হেমন্তের শিশির।

সময় এবং জনগণের ভালোবাসার দাবিকে সামনে রেখে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছে উদীচী। বহু ত্যাগী সৃজনশীল কর্মীর মেধা ও মননের সমন্বয়ে আজকে তার গৌরবের ৪০ বছর পূর্ণ করছে। যেখানে প্রতিদিনই নতুন নতুন সংগঠনের জন্ম হচ্ছে আবার তা কিছুদিনের মধ্যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে উদীচী তার জন্মের অঙ্গীকার এবং স্বাধীনতাউত্তর কালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী বিশেষ করে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উদীচীর ভূমিকা অপরিসীম।

আসলে গণআন্দোলনের দাবিতে পরিকল্পিতভাবেই সংগঠিত হয়েছিল উদীচী, আর স্বাধীনতার পরপরই এই সংগঠন কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে না থেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মী, সুভানুধ্যায়ীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাখার বিস্তার লাভ করে। কেবল তাই নয় প্রবাসেও যেখানে বাঙালি রয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে উদীচীর সংগঠন। উদীচীর "ইতিহাস কথা কও" স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে গণসঙ্গীত চর্চায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। কেবল তাই নয়, পচাত্তর পরবর্তীকালে ভয়ভীতি এবং দুই সামরিক স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গণসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। বলাই বাহুল্য স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি রোধে তাদের "ইতিহাস কথা কও" গীতিনাট্য এক সাহসী উচ্চারণ। সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঢাকার শহরতলীর কেরাণীগঞ্জের ইস্পাহানী কলেজ মাঠে, রমনার বটমূলে কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে এর সাহসী মঞ্চায়ণ আমাকে উদীপ্ত করে, কোন কোন অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলাম আমি। কেবল তাই নয় এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ করে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে, প্রতিটি জাতীয় দুর্যোগে দূর্বিপাকে ৯৬ এর গণ আন্দোলনে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিষ্ঠিত জনতার মঞ্চেও সাহস জাগানিয়া গণসঙ্গীত পরিবেশন করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ৯৬ র গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সব জায়গাতেই যেমন ছোঁয়া রয়েছে গণসঙ্গীতের তেমনি রয়েছে উদীচীর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

উদীচীর জন্মই হয়েছিল গণসঙ্গীত দিয়ে। সহজভাবে গণমানুষের নিকট যাওয়া যায় একমাত্র গণসঙ্গীতের মাধ্যমেই। তাই উদীচী সাধারণ মানুষের সহজ জীবন ধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে এই সহজ পথটি গ্রহণ করেছে। এদেশের গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার একাগ্র শক্তি, আর্দশ ও আত্মত্যাগের মহান ঐতিহ্যের গর্বিত বাহক উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী আজও তাই সমাজতন্ত্রে ও মানবমুক্তির সংগ্রামে আগুয়ান।

কেবল গণসঙ্গীত নয় উদীচীর সংস্কৃতিচর্চার আর একটি দিক হচ্ছে জনগণভিত্তিক নাচ। বহুকাল ধরে এ দিকটি দিয়ে চিন্ড্র ভাবনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। উদীচীর সদস্য সদস্যাদের আন্ড্রিক প্রচেষ্টায় বিগত ৭৩ সাল থেকে একটি নাচের দল গঠিত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে থেকে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসানের নেতৃত্বে ১৯৭৭-৮৮ এ এসে উদীচীর নাচের মহড়া এবং নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ শুর" হয়। তারপরও বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে উদীচী নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণকে উদ্দীপিত করেছে। জানি না নাচের দলটি এখোনো সক্রিয় আছে কিনা তবে উদীচীর নাট্য বিভাগ নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উদীচী গণসঙ্গীতের একটি গোষ্ঠী বা দল হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। এবং তার এই পরিচিতি বর্তমানে এতোটা প্রসারী যে, উদীচী যে কখনো নাটক মঞ্চস্থ করেছে কিংবা বাংলাদেশের নিকট অতীতের প্রায় উর্বর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে একটি আন্ড্রিক ভূমিকা নিতে চেয়েছিল, সেই ঘটনা আজ দার"ণভাবে সফল হয়েছে। উদীচী নাটক করেছে একটি দুটি নয় অনেক। উদীচী এখন গ্র"প থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যম"িত নাটকে একটি পরিপূর্ণ দল।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর চারদশকের এই প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগঠনের ভাইবোনদের আমার অভিবাদন ও শুভকামনা জানাই। তারা জনসাধারণের জীবনমাত্রার সংগ্রামে তাদের সঙ্গে শরিক হওয়ার সংকল্প নিয়ে যে পথচলা শুর" করেছিল, আজও সেই আর্দশকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলেছে। উদীচীর ভাইবোনদের আর্দশ নিষ্ঠা ও আন্ড্রিকতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তবে এটা আমার ধারণা, সংগঠন শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির সাথে সাথে এর শক্তি সাহস এবং জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েছে একই সাথে দায়িত্ব ও তেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, উদীচী তার যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই তার সঠিক গন্ড্রব্যে পৌঁছতে পারবে। এই সংগঠনের ৪০ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে যেমন স্মরণ করছি প্রাণপুর"ষ সত্যেন সেন, রণেশ দাসগুপ্ত কে। তার পাশাপাশি স্মরণ করছি জীতেন দা, সাত্তার ভাই, জামদা, অনিমা সিং, শহীদ শহীদুল- াহ কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, জহির রায়হান, শেখ লুৎফর রহমান, কলিম শরীফ, সুখেন্দু চক্রবর্তী, অজিত রায়, জাহিদুর রহিম, ড. হায়াৎ মাহমুদ, গোলাম মোহাম্মদ ইদু, হাসান ইমাম, পান্না কায়সার, আবুজাফর, শামসুদ্দিন, আবুল

ফজল, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, সনজীদা খাতুন, তরু প্রমুখ উদীচীকে সবদিক দিয়ে পরামর্শ , সাহায্য সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

এছাড়া উদীচীর নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম মোহাম্মদ ইদুর স্মৃতিচারণে, যাঁরা নিজের অমূল্য সময় উদীচী গঠনে দান করেছেন তাঁদের মধ্যে উলেণ্ঢখ্যযোগ্য, কামরুল আহসান এবং মোস্ড়ফা ওয়াহিদ, বদরুল আহসান খান ইকরাম আহমেদ, রিজিয়া বেগম, শাম্মি, ইকবাল আহমদ, পারভীন, এনামুল হাফিজ বাচ্চু, শওকত হায়াত খান, ফকির সিরাজ, ফিরোজ সাঁই, পারভেজ সামসুদ্দিন, জিয়া (ডাক্তার), অরুণ, ইমরুল, হারুন, জগলুল, তাজিম, রোকেয়া, মম, সেলিমা, স্বপনভাবী, শামীমা, শাহানা, হেলেনা, আভা মন্ডল, মরিয়ম, লীনা দি, মঞ্জুর মোর্শেদ প্রমুখ।

এছাড়া পর্যায়ক্রমে যেসব সংগঠক, শিল্পী, গীতিকার সুরকার উদীচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে মতলুব আলী, আখতার হোসেন, সেন্টু রায়, জিনাত জাহান, লায়লা হাসান, ফেরদৌস হোসেন ভূইয়া, মোনায়েম সরকার, নজরুল ইসলাম মনজু, রঞ্জু সরকার, রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা, খায়রুল আহসান খান, মাহমুদ সেলিম, ফয়সাল, তিমির নন্দী, মোফাখখারুল, জাপান, শিল্পী আনোয়ার হোসেন, শিল্পী আমিন আহম্মেদ, মিয়া সিরাজুল ইসলাম, আবদুল খালেক, সুইট, দীপংকর গৌতম, সেলিম রেজা, কাজী মদীনা, রাশেদা আহসান, তোতা, হাবিবুল, হাসান মাসুদ, মনির আহম্মেদ, শামসুজ্জামান খান, মফিদুল হক, আসাদ চৌধুরী, পিন্টু ভট্টাচার্য, গোলাম মহিউদ্দিন, শিবানী ভট্টাচার্যসহ এই নিবন্ধের লেখক স্বাধীনতাত্তোর কয়েক বছর উদীচীর অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

*সভাপতি, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী*

# উদীচীকে আরও আনেক দূর যেতে হবে

নিরঞ্জন অধিকারী

উদীচী।
একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।
একটি আন্দোলন।

সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে শ্রমিক কৃষকদের সংযুক্ত করার জন্যই উদীচীর প্রতিষ্ঠা। উদীচীর প্রতিষ্ঠায় অগ্রনায়ক সত্যেন সেন যে কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। তাই উদীচীর সাংস্কৃতিক কর্মকাে ের পেছনে উদীচীর বিশেষ একটি চেতনা কাজ করে যায় ভেতরে ভেতরে। তা হচ্ছে কেবল সংস্কৃতি চর্চার জন্যেই সাংস্কৃতিক কর্মকা  নয়, সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সচেতনতার সৃষ্টি করা। উদীচীর অঙ্গীকার নিপীড়িত মানুষের গান গাইবার অঙ্গীকার। উদীচী তার ঘোষনা পত্রে স্পষ্টভাবে উলেণ্ঢখ করেছে।

মানুষে মানুষে বৈষম্য ও পীড়ন সৃষ্টিকারী অবাধ ধনবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেশ ও সমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের চরম অবক্ষয় ও সংকটের যুগে তৃতীয় বিশ্বের একটি অতি পশ্চাৎপদ দেশে বৈষম্য মূলক ধনবাদী অর্থনীতি কায়েম করার অর্থ একদিকে যেমন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণের নিপীড়নের শিকারে পরিণত করা, অপরদিকে গোটা দেশকে নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিকট বন্ধক রেখে দেওয়া।

আর এ কারণ জাতীয় সংস্কৃতি বিকৃত হচ্ছে। উদীচীর কাজ সমাজকেও সংস্কৃতিকে এ বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সমসমাজ এবং সেই সমাজের সংস্কৃতি বিনির্মাণ। সাংস্কৃতিক কর্মকাে ের মধ্য দিয়েই এ প্রত্যাশাকে বাস্ড়বে রূপায়িত করার যে সংগ্রাম উদীচী চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে আরও প্রসারিত এবং বেগবান করতে হবে। তাই উদীচী বলে।

আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি শিল্পী ও শিল্পের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে নিরন্তর প্রগতি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া,মানুষের সার্বিক কল্যানে নিয়োজিত হওয়া।

এখানেই উদীচী সংশিণ্ঢষ্ট শিল্পী এবং উদীচী শিল্পী চেতনার সঙ্গে অপরাপর শিল্পী ও তাদের চেতনার মধ্যকার মূল পার্থক্য। অনেক শিল্পী আছেন, যাঁরা শিল্প প্রতিভায়, মেধায় অনেক উচ্চে অবস্থান করছেন, অনেক শিল্পী আছেন, যাঁরা ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশের জন্য সাধনায় নিরত। তাঁরা নমস্য। শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁরা কেবল ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে শিল্পের জন্যই শিল্পের চর্চা করে যচ্ছেন, নিজেকে নিয়ে

গেছেন বা নিয়ে যেতে চাইচ্ছেন খ্যাতি পরিচিতির শীর্ষে। উদীচী সংশিণ্টষ্ট শিল্পী ও ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশ অবশ্যই ঘটাবেন, নিজেকে নিয়ে যাবেন আরও উন্নত স্ড়রে, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি হবেন সমাজ মনস্ক, সামাজিক বৈষম্য বিরোধী নিপীড়ন বিরোধী, প্রগতির পথিক একজন কর্মী। শিল্পীর প্রজ্ঞা ও কর্মীর সক্রিয়তার মিশ্রণেই গড়ে ওঠে উদীচী শিল্পীর শিল্পসত্তা।

উদীচী তাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে মুক্তিপথ রচনার এই নিরন্ড়র ও একনিষ্ট কর্ম তৎপরতার অন্ড়িমে উদীচী সেই সমাজ গঠনের নিশ্চিত পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে যে সমাজে সুষ্ঠু মানবতাবাদী সুকুমার বৃত্তিগুলো হবে পরিপূর্ণ বিকাশ, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সেখানে বেড়ে উঠবে এক পরিপূর্ণ মানবিক গুণাবলী ও অধিকার সম্পন্ন মনুষ হিসেবে, যেখানে আমরা দেখবো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল নবজাগরণ।

ব্যক্তিগতভাবে শিল্প সাধনায় যেমন নিমগ্ন থাকেন উদীচীর শিল্পী, তেমনি তিনি জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল নব জাগরণের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে উদীচীর কাজ করে যান পরম নিষ্ঠায় এবং গভীর দায়িত্বশীলতায়।

উদীচীর প্রতিটি কর্মীকে তাই আরও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আরও অনেক দূরে যেতে হবে।

আমাদের শিল্প প্রতিভা কেবল আমাদের নয়, তা জনগণেরও সম্পদ। তাদের কাছ থেকেই নেয়া এ সত্য উদীচীর শিল্পী কর্মীকে সর্বদা মনে রাখতে হবে।

দেশ ও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশেণ্টষণ করতে হবে নিপীড়িত মানুষের অবস্থান থেকে। তারপর প্রগতির অন্ড়রায় গুলোকে দূর করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে শোষণের শৃঙ্খল। আর সবই করতে হবে শিল্পের মাধ্যমে, সংস্কৃতি চর্চার প্রবাহিত ধারায়। ভাষা দিতে হবে নিপীড়িত মানূষের আশাকে। নাট্যে সঙ্গীতে নৃত্যে আবৃত্তিতে এবং আলোচনায় এ সত্য ধ্বনিত হোক। এই সুর বেজে উঠুক, বাজতে থাকুক অবিরাম।

# উদীচী : বিপণ্ঢবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার

মাহমুদ সেলিম

উদীচী প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপণ্ঢবের বিজয়ের পর বিশ্ববাসী নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুর" করে শোষণমুক্তির। বুঝতে শুর" করে পুঁজির শৃঙ্খল তাহলে শেষ কথা নয়। নতুন যুগের ভোরে বিশ্ববাসী জেগে উঠতে শুর" করে। শামিল হয় জাগরণের মিছিলে। সে মিছিলে যোগ দেয় ভারতবর্ষের মানুষেরাও। সে মিছিল প্রগতির মিছিল। আর মিছিলের মানুষদের অভিধা হয় প্রগতিশীল। এক নতুন আলোকে বিশ্বটাকে এরা দেখতে পায় নতুন করে। গড়ে ওঠে নতুন শিল্প - সাহিত্য - কবিতা - গান - নৃত্য - নাটক - চলচ্চিত্র - চিত্রকলা ভাস্কর্য - বিশ্ববীক্ষণের এই নতুন আবেগে। এই নতুনধারার শিল্পকলা বিকশিত হয় কোথাও-প্রগতিশীল রাজনীতির অগ্রগামী, কোথাও সহগামী আবার কোথাও অনুগামী হয়ে।

এরই ধারাবাহিকতায় চলিণ্ঢশের দশকে ভারতবর্ষে একে একে গড়ে ওঠে Youth's Cultral Institute, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি। ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ-এর ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালে। এর নিয়মিত সদস্য ছিলেন সতীশ পাকড়াশী, সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সত্যেন সেন, পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিম। এদের মধ্যে দুজন সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্ত উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা এবং দুজন মুনীর চৌধুরী (শহীদ) ও সরদার ফজলুল করিম উদীচীর অন্যতম উপদেষ্টা। এঁদের সবারই যোগ ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে।

সত্যেন সেন উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায় - বিপ- বী নয়া ধ্র"পদী গণকথাশিল্পী সত্যেন সেন 'উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানে যাঁরা নিরন্ড়র (বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকে আশির দশক পর্যন্ড়) একটার পর একটা দায়িত্ব পালনে ব্রতী ও উদ্যোগী থেকেছেন' সেই কর্মীদেরই একজন। রণেশ দাশগুপ্ত যদিও নিজের কথা বলেন নি, কিন্তু আমরা জানি - তিনিও তা-ই ছিলেন। এই চেতনাই ছিল সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্তের জীবন ও শিল্পবোধের কেন্দ্রীয় প্রেরণা।

এই প্রেরণার তাগিদেই সত্যেন সেন ১৯৪০ সনে নারী আত্মরক্ষা সমিতির জন্য গান লেখেন - "ওঠো ভারতের নারী" (সূত্র : শ্রীমতি নিবেদিতা নাগ), ১৯৪২ সালের নভেম্বরে লেখেন "লীগ কংগ্রেস এক হও", ১৯৪৩ এ দুর্ভিক্ষের উপর বেশ কিছু

জনপ্রিয় গান লেখেন, যার একটি 'চাউলের মূল্য চৌদ্দ টাকা, কেরোসিন তেল নাইরে, কী করি উপায়'। একই প্রেরণায় ১৯৪৬ সালে কমরেড ব্রজেন দাশের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কবিয়াল দল গঠন করেন। ইতোমধ্যে ১৯৪৩ সনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং ১৯৪৪ সনে গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র বাংলা শাখা গঠিত হয়েছে সেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শেরই প্রেরণায়। সেই একই উদ্দেশ্যে সত্যেন সেন গঠন করেন উদীচী - কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীলদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। এসময় প্রগতিশীলরা গড়ে তোলেন 'শিখা' গোষ্ঠী এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

সত্যেন সেন ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর ১৯৪৯ পর্যন্ড় আত্মগোপনে, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ড় কারান্ড়ালে থাকতে বাধ্য হন।

এত নির্যাতনের মধ্যেও কৃষকদের ও শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টরা কাজ করে চলেছেন। এমনি একজন সর্বস্বত্যাগী নেতা ছিলেন সত্যেন সেন। তিনি কাজ করতেন কৃষকদের মধ্যে। তিনি কাজ করতে গিয়ে দেখলেন বক্তৃতার চেয়ে কৃষকদেরকে গান দিয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করা যায়। তিনি চলিণ্ডশ পঞ্চাশের দশকে অজস্র গণসঙ্গীত লিখেছেন, সুর করেছেন, গেয়েছেন। নিজে ছিলেন শিল্পী। পাশাপাশি নিকট অতীতেই ছিল গণনাট্য সংঘের অভিজ্ঞতা।

১৯৫৬'র ঢাকা জেলা কৃষক সম্মেলন থেকে সত্যেন দা এমন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরির তাগিদ হৃদয়ে লালন করেন- যে সংগঠন গান, নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বদলের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সেই আদর্শ সামনে রেখে কিছু উৎসাহী তর"ণের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন "সৃজনী সাহিত্য ও শিল্পীগোষ্ঠী"। এর পর তিনি একটি গানের দল তৈরি করলেন। এই দল তৈরি করার পর পরই সত্যেন সেন কারার"দ্ধ হন এবং বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। কিন্তু তাঁর তৈরি এ দলটির কর্মকা" টিকে থাকে। গানে এ দলের হাল ধরেন গোলাম মোহাম্মদ ইদু ও সাইদুর রহমান। সাথে ছিলেন আবদুল করিম, আবদুল খালেক প্রমুখ। শিল্পী জাহিদুর রহিম মাঝে মাঝে এই দলটির সাথে যুক্ত হতেন। এর সাথে যুক্ত হন সৃজনীর শুভ রহমান, মোজাম্মেল হোসেন মন্টু, আবেদ খান, নিয়ামত হোসেন, ইউসুফ পাশা, ইয়াহিয়া বখত প্রমুখ। এঁরা সবাই ছিলেন লেখক সাহিত্যিক কবি ও গল্পকার। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ড় এই নামহীন দলটি বিভিন্ন কৃষক সমাবেশে ও শ্রমিক জমায়েতে গান গেয়েছে। ১৯৬৫-৬৭ তে এর সাথে যুক্ত হন বদর"ল আহসান খান, মো"ড়ফা ওয়াহিদ খান, রাজিয়া বেগম, আখতার হুসেন, পারভেজ শামসুদ্দিন, মজনু মনির প্রমুখ। এ দলের গানগুলোর বেশির ভাগই ছিল বিদ্রোহী কবি নজর"ল ইসলামের গান, বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথের দেশ পর্যায়ের গান, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তৎকালীন প্রচলিত কিছু বাংলা ও হিন্দী গান এবং সত্যেন দার নিজের লেখা ও সুর করা গান।

প্রথমে নারিন্দায় সাইদুর রহমানের বাসায় মহড়া শুর" হয়। স্থানীয় ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পরে মুক্তধারা, আবেদ খানের বাসা, হাশেম খানের বাসা, স্বপন ভাবীর বাসা সর্বত্রই প্রায় একই অভিজ্ঞতার পর শান্ড়িনগরে পীর হবিবুর রহমান মোর্শেদ আলী ও মোনায়েম সরকারের মেস যা ন্যাপের মেস নামে পরিচিত ছিল- সেখানে দলটি উঠে আসে। এখানে মসজিদ কমিটি মহড়ায় আপত্তি জানালে দলটির শুভানুধ্যায়ীরা পাল্টা হুমকি প্রদান করেন এবং দলটির বির"দ্ধে মসজিদে প্রচারিত ইসলামী ছাত্র সংঘের লিফলেট কেড়ে নেন। এতে কাজ হয়। এ সময় একদিন সত্যেন দা দলটির নামকরণের প্রস্ড়াব দেন এবং নিজেই নাম রাখেন "উদীচী"।

**প্রতিষ্ঠাকাল:**

পাকিস্ড়ানি শাসন শোষণের বির"দ্ধে যখন ফুঁসে উঠছিল বাংলার আপামর মানুষ। একটি কালজয়ী গণঅভ্যুত্থান উঁকি ঝুঁকি মারছে। এমনি সময় ঢাকা তথা গোটা বঙ্গদেশের গণসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের নেতৃত্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৮)। সত্যেন সেনের মত নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী, সৎ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নেতৃত্বের জন্যে উদীচী দ্র"ত বিকশিত হতে থাকে। গণনাট্য আন্দোলনের সময় যেমন ব্যাপকসংখ্যক বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, বাংলাদেশে উদীচীর ক্ষেত্রেও কতক পরিমাণে সেটাই সম্ভব হয়েছে। প্রথম থেকেই এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকেন বা সহায়তা করেন আবুল ফজল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শেখ লুৎফর রহমান, আনিসুজ্জামান, সনজিদা খাতুন, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আলতাফ মাহমুদ, জাহিদুর রহিম, আব্দুল লতিফ, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিমা সিংহ, হাসান ইমাম, পান্না কায়সার প্রমুখ।

একজন ভাষ্যকার লিখেছেন "বাংলাদেশে নব সংস্কৃতি বিশেষতঃ গণসংগীতের ক্ষেত্রে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা"। প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী সংগ্রামী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সত্যেন সেন ছিলেন উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উদীচীর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হওয়ার পূর্বে যে আহবায়ক কমিটি গঠিত হয় তার আহবায়কের দায়িত্ব দেয়া হয় কামর"ল আহসান খানকে।

সদস্যবৃন্দ ছিলেন সত্যেন সেন, গোলাম মোহাম্মদ ইদু, মোস্তফা ওয়াহিদ খান, ইকরাম আহমেদ, আখতার হুসেন, বদরুল আহসান খান, রাজিয়া বেগম, মঞ্জুর মোরশেদ প্রমুখ।

**প্রথম পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিম্নরূপ**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | সত্যেন সেন |
| সহ-সভাপতি | : | গোলাম মোহাম্মদ ইদু |
| সাধারণ সম্পাদক | : | মোস্তফা ওয়াহিদ খান |
| সহ-সাধারণ সম্পাদক | : | ইকরাম আহমেদ |

অন্যান্যরা ছিলেন রাজিয়া বেগম, ইকবাল আহমেদ, আখতার হুসেন, মাহফুজ আলী মলি- ক, তাজিম সুলতানা প্রমুখ।

**উদীচী কেন অন্য সংগঠন থেকে আলাদা**

উদীচী শুধুই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়। উদীচী একটি আন্দোলন। উদীচী কেবল সংস্কৃতিচর্চা করে না, গণমানুষের সংস্কৃতি চর্চার পথ নির্দেশও করে। সত্যেন দা খুব সচেতনভাবেই উদীচী নামটি নির্বাচন করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, উদীচী অর্থ উত্তর দিক, বা ধ্রুবতারার দিক। দিকহারা নাবিকেরা যেমন উত্তর দিকে ধ্রুবতারার অবস্থান দেখে তাদের নিজ নিজ গন্তব্য স্থির করেন- তেমনি এদেশের সংস্কৃতি তথা গণমানুষের সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবকিছুই উদীচীকে দেখে তার চলার পথ চিনতে পারবে। এ জন্যেই উদীচী অপরাপর সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে আলাদা।

উদীচী দেশ ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহকে উপলব্ধি করবে, তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ সমূহকে উদঘাটন করবে এ সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করবে, তাদেরকে এই দুঃখ কষ্টের কারণসমূহ মোকাবেলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগাবে, এভাবে দেশ ও জনগণের ইতিহাসের ক্রান্তিকাল সমূহ সৃষ্টি করবে তা অবলোকন (Monitor) করবে- তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে পরিণতির দিকে এবং আবার তাদেরকে নতুনতর সংগ্রামের জন্য তৈরি করবে। এসবই করবে উদীচী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে।

উদীচী সমাজ সচেতন, সমাজ পরিবর্তনের নিয়মসমূহ ও কারণসমূহ সম্পর্কে সচেতন। উদীচীর কর্মীরা শুধু নিজেরাই সচেতন হওয়া নয়, জনগণকেও সচেতন করাকে কর্তব্য মনে করে। মানুষের প্রতি এই কমিটমেন্টের জন্যই উদীচী আর সবার থেকে আলাদা।

## উদীচীর গাওয়া গানের ধরণ

উদীচী মূলতঃ গণসঙ্গীতের সংগঠন। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী তথা মেহনতী মানুষের উপর মুষ্টিমেয় শোষকের অত্যাচার নিপীড়নের বির"দ্ধে প্রতিবাদমূলক এই সকল গান। এসকল গানে থাকে শোষণের স্বরূপ উদঘাটন শোষকের স্বরূপ এবং শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংগঠিত আন্দোলনের প্রণোদনা। কারণ উদীচী মনে করে সমাজ সংস্কৃতির প্রকৃত নির্মাতা জনগণ। অথচ তারাই সমাজ সংস্কৃতির সকল প্রকার সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে। এই বঞ্চিত মানুষের হাতে তাদের শ্রমের সার্বিক ফসল তুলে দেয়ার পরিবেশ রচনা করতে হলে বর্তমান শোষণমূলক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। আবার এই ইতিবাচক পরিবর্তন গণমানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। সে কারণেই গণমানুষকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং তা আদায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা দেয় উদীচী।

উদীচীর গাওয়া গান শুধুমাত্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে না- সাধারণ মানুষের সহজবোধ্যতার দিকেও লক্ষ্য করে। তাই উদীচীর গানকে জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় এবং তাদের প্রাণের সুরকে অবলম্বন করেই রচনা করার চেষ্টা করা হয়।

## উদীচীর বিশেষ অবদান

ক. এদেশের প্রথম পথনাটক মঞ্চায়ন : উদীচী জলগ্ন থেকেই মঞ্চনাটক করে আসছে। যেমন ১৯৬৮তে বাংলা একাডেমীতে মঞ্চনাটক "আলো আসছে"র মঞ্চায়ন। কিন্তু পথনাটকের ক্ষেত্রে উদীচী এদেশে পথিকৃৎ। ১৯৬৯ এর ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ স্বৈরাচারী আইয়ুবের পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনার বির"দ্ধে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উদীচী ঢাকা নগর ও শ্রমিক অঞ্চলে "শপথ" নামে পথনাটক পরিবেশন করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উল্কার বেগে নিউমার্কেট কাঁচাবাজার, সেকেন্ড গেট বিএমএ মাঠ, বায়তুল মোকাররম চত্বর, সদরঘাট টার্মিনালের পাশে, ধুপখোলা মাঠে, কমলাপুর রেল স্টেশনের পণ্যাটফর্মে, বাংলা একাডেমী বটমূলে, ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে, বাওয়ানী ও আদমজী জুট মিল মাঠে এই পথনাটক মঞ্চস্থ হয় এবং গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এর পরই জহির রায়হানের "পোস্টার" গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে পথনাটক মঞ্চস্থ হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ অন্যান্য স্থানে।

খ. ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর সাহসী ভূমিকা : ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকা"ের পর সমগ্র জাতি যখন স্ড়ম্ভিত; রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন জেলে কিংবা আত্মগোপনে; বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের নামোচ্চারণ যখন সম্পূর্ণ নির্বাসিত, তখন উদীচী প্রথম প্রচ" সাহসের সাথে বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর অবদান, তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ লোকজ ফর্মে ও সুরে গীতিআলেখ্যের ভিতর দিয়ে তুলে ধরে। আলেখ্যটির নাম

"ইতিহাস কথা কও"এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৬ এর ১৬ ডিসেম্বর কেরানীগঞ্জের ইস্পাহানী কলেজের মাঠে। এর পরে ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রমনা বটমূলে "ইতিহাস কথা কও" এর নির্ধারিত মঞ্চায়ন যখন নিষিদ্ধ হয় তখন সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রোকেয়া হলের সামনের রাস্তায় ১৫/২০ হাজার দর্শকের সামনে মঞ্চায়িত হয় "ইতিহাস কথা কও"। তারপর সারাদেশের আনাচে কানাচে উদীচীর ২শতাধিক শাখার মাধ্যমে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার জন্য 'ইতিহাস কথা কও' বহু সহস্রবার মঞ্চায়িত হয়েছে।

গ. রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গঠন ও বিস্তারে উদীচীর ভূমিকা : ১৯৭৮ এ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহিদুর রহিম এর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে গঠিত জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে সারা দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উদীচীর তৎকালীন সভাপতি কলিম শরাফী, সনজীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে এই কার্যক্রমের এক পর্যায়ে ১৯৮০ সনে বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই পরিষদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ"। শুরু থেকেই এর নেতৃত্বে ছিলেন উদীচী তৎকালীন সভাপতি কলিম শরাফী, ছায়ানটের সভাপতি সনজীদা খাতুন। সারাদেশে উদীচীর শাখাসমূহের সহায়তায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ বিস্তৃতি লাভ করে এবং এর শাখাসমূহ গড়ে ওঠে। এখনও সারাদেশে উদীচীর নেতা-কর্মীবৃন্দই এই সংগঠনের মূল সহায়ক শক্তি।

ঘ. সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠন ও বিস্তারে উদীচীর ভূমিকা : ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্মিলিতভাবে একুশ উদযাপন কমিটি গঠনের আহবান জানিয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার অপরাধে উদীচীর তৎকালীন সভাপতি কলিম শরাফী তাঁর উচ্চপদের সরকারী চাকুরী হারান। তার দীর্ঘদিন পর ১৯৮২ সালে পুনরায় একুশ উদযাপন কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের মূল সংগঠক ছিলেন কবি, ছড়াকার ফয়েজ আহমদ, উদীচীর মাহমুদ সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের মনজুর আলী ননতু প্রমুখ। পরবর্তীকালে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের দেশব্যাপী বিস্তারে উদীচীর জেলাসংসদ ও শাখাসমূহ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ঙ. '৯০ এ স্বৈরাচার পতনে ভূমিকা : ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত উদীচী একনাগাড়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গান ও পথনাটক রচনা করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছে। গানগুলোর মধ্যে ছিল "নতুন বাংলাদেশ" এর প্যারডি "নতুন জংলি ড্রেস", কথা কইলে হেয় চেইত্যা যায়, কুহুকুহু ডাক শুনিয়া, বড় গঙ্গে শাসনতন্ত্র এবং আরও অনেক গান ও পথনাটক। উদীচী যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ

করেছে। ১৯৯০ এর জনতার মঞ্চে উদীচী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ এর 'জনতার মঞ্চে'ও উদীচী ভূমিকা পালন করে।

চ. স্বাধীনতার ইতিহাস প্রতিযোগিতা : ১৯৭৫ এর পর থেকে স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি ক্ষমতায় থাকার কারণে স্বাধীনতার সত্যিকারের ইতিহাস বিকৃত করে ভ্রান্ড় ইতিহাস তর"ণ সমাজকে শেখানো হচ্ছিল। ১৯৯০ এর পর এই বিকৃতি চরমে পৌঁছে। এর বির"দ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী শিশু কিশোরদেরকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস পাঠ করানোর মানসে ১৯৯৪তে উদীচী গঠন করে "স্বাধীনতার ইতিহাস প্রতিযোগিতা পরিষদ"। এর অধীনে সারাদেশের ১৩৫টি থানায় অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ৪৫০০০ ছাত্রছাত্রী উদীচী প্রকাশিত ড. মোহাম্মদ হাননান রচিত "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: কিশোর ইতিহাস" বইটি নামমাত্র মূল্যে কিনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সারা দেশের থানা পর্যায়ে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীর দশজন করে ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। সকল থানার প্রথমস্থান অধিকারীকে ঢাকায় এনে পুরস্কৃত করা হয়। এতে শিশু কিশোরদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পঠনে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

উদীচীর চলি- শ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস নানা চড়াই-উৎরাই, বাধাবিপত্তি, আনন্দ বেদনার ইতিহাস। কিন্তু উদীচীর পথচলা কখনও থেমে থাকেনি। এ বছরে উদীচীর চলি"শ বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন সময় এসেছে উদীচীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার। উদীচীর সাথে যাঁরা দীর্ঘ সময় সুখে দুঃখে জড়িয়ে ছিলেন-তাঁরাই রচনা করবেন এ ইতিহাস। আমরা সে দিনের পথ চেয়ে আছি।

# চার দশকের সংগ্রামী উদীচী

রতন সিদ্দিকী

প্রস্থিত শতাব্দীর ষাটের দশক ছিল বাঙালির জন্য প্রখর রুদ্রের ফাঁক আর ফাঁকিতে ভরা পাকিস্তান সম্পর্কে ততোদিনে তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। নৈরাশ্য ও গণ্ডানিতে দগ্ধ বাঙালি জাতি তখন স্বীয় স্কন্ধ থেকে পাকিস্তান প্রীতির কদর্য বোঝা নামাতে ব্যাকুল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা এগার দফাসহ বিচিত্র পশ্চিম বিদ্বেষী আচরণে। বাঙালি মনে প্রাণে প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন পরিচয়ের। এ রকম আন্দোলন মুখরিত ষাটের প্রান্তিক পর্যায়ে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের নিকট পূর্বে ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর গঠিত হয় উদীচী।

শিল্পী সংগ্রামী কমরেড সত্যেন সেনের দীর্ঘ চিন্তার ফসল উদীচী। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালির সুনির্দিষ্ট গন্তব্য স্বাধীনতা আর মুক্তির ঠিকানা সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতি আন্দোলন খুবই জরুরি। জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিতে গেলে সংস্কৃতির হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। রুদ্রের বীণায় বাজাতে হবে মুক্তির সুর। সে লক্ষ্যে ঢাকা নগরীর উত্তর প্রান্তের নারিন্দায় সাইদুল ইসলামের বাসায় বসলো সভা। সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, গোলাম মোহাম্মদ ইদু, কামরুল আহসান খান, মোস্তফা ওয়াহিদ খান, সাইদুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন সভায় উদীচী গঠনের সিদ্ধান্ত হলো। উত্তর আকাশের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র উদীচী যা অভিযাত্রী দলকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ দেখায়, সেই নক্ষত্রের নামে হলো সংগঠনের নাম উদীচী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় আবাসের নাম উদীচী, তাও বিবেচিত হলো।

এরপর উদীচীর পথ চলার সূচনা। প্রথমে গণসংগীতের দল তৈরি হলো। গীত হলো সমবেত কণ্ঠে মুক্তি ও দ্রোহের গান। ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত তখন রাজনীতির মিছিলে। সে মিছিলের শ্লোগান গতিময় হয়ে উঠল উদীচীর ছন্দবদ্ধ সুরেলা কণ্ঠে। গনঅভ্যুত্থানের প্রাক-পর্বে উদীচীর গান হলো মিছিলের সাহসী যৌবনের প্রণোদন। ঐ বছরই ঢাকার মঞ্চে প্রথম নাটক করল উদীচী। নাম "আলো আসছে"। ঊনসত্তরে ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হলেন। আসাদের শার্ট হলো শামসুর রাহমানের কবিতায় পতাকা আর উদীচী গান ও নাটকে আসাদের জীবনদানকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করল। সত্তুরের জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন, দুস্থানেই উদীচী রাখল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এল মহান মুক্তিযুদ্ধ। উদীচী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো 'মম এক হাতে বাঁকা বাশের বাশরী আর হাতে রণতূর্য' নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। অসুরপুরে

সুরের লহরী তুললো। স্টেনগানের গুলির মতোই বেজে উঠলো উদীচীর কণ্ঠ। স্বাধীনতা উত্তরকালে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে উদীচী গণমানুষকে জাগ্রত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। জেলায় জেলায় শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত উদীচী সংস্কৃতির অবিনাশি শক্তি নিয়ে যখন কর্মকা- পরিচালনা করছে তখন এল চুয়াত্তরের সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। উদীচী দুর্ভিক্ষপীড়িত বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এল পচাত্তরের পনেরোই আগস্ট। নিহত হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ব্যক্তি মুজিবের সাথে নিহত হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ। আহত হলো পবিত্র সংবিধান। পরিকল্পিতভাবে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চা নিষিদ্ধ হলো সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের নষ্ট চিন্তার আদেশে। পিছনে গমন করা বাংলাদেশ সেনা শাসকদের পরিপূর্ণ পরিচর্যায় এবং বিশ্বদানব সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় প্রসন্নচিত্তে প্রসব করল সাম্প্রদায়িকতা এই সদ্যজাত সাম্প্রদায়িকতা। রাজনীতি থেকে শুর- করে বাঙালির মনোজগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। এরই মধ্যে সুস্থতা যখন নির্বাসিত, বঙ্গবন্ধু যখন নিষিদ্ধ তখন উদীচী ১৯৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'ইতিহাস কথা কও' গীতিআলেক্ষ্য উপস্থিত করল বাঙালির মহাকাব্য ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্র-য়ারি রমনায় ছয় ফুট দীর্ঘ মাইকের স্ট্যান্ডকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে অনুষ্ঠান করাল উদীচী। যেদিন বঙ্গবন্ধুর প্রতীকী উপস্থাপনায় রমনায় সমবেত সকলে নতুন করে দ্রোহে উৎসাহিত হলো।

১৯৭৮ সালে যখন সেনাসরকার যাত্রাকে নিষিদ্ধ করল, মন্দিরে প্রতিমা ভাঙ্গল মৌলবাদীরা তখন উদীচী সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠে নামল। ঘোষণা দিল দ্বিতীয় যুদ্ধের। এবারের যুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বির-দ্ধে। যুদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধীদের বির-দ্ধে। মাঠে ময়দানে, কলে-কারখানায়, প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর অনাদৃত প্রাঙ্গনে উদীচীর গান, নাটক, কবিতা পরিবেশিত হলো। সেখানে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বির-দ্ধে উদীচীর বীণায় ধ্বনিত হলো র-দ্রের বীণা।

রক্তাক্ত পতাকা, ক্ষত-বিক্ষত সংবিধান, বিবর্ণ মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, বিপন্ন মূল্যবোধ, ভোগবাদের প্রলোভন, পুঁজিবাদের দানবীয় উত্থান, সামরিক স্বৈরাচার, নষ্ট রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা সব মিলিয়ে আশির দশকের বাংলাদেশ যেন অচেনা প্রান্তর। উদীচী আরো ধ্বংসের আশংকায় উদ্বিগ্ন হলো। মানবিক মূল্যবোধের সর্বোদয় জাগৃতি ও বিকাশে শিল্পীর দায়িত্ব থেকে গৃহীত হলো উদীচীর বিচিত্র কর্মসূচি। উর্দি শাসনের বির-দ্ধে উন্মাতাল বাংলাদেশের শত সহস্র বিক্ষোভে উদীচী সম্পৃক্ত হলো সর্বাত্মক শক্তিতে। এল প্রত্যাশিত ৯১ এর গণতন্ত্র। অথচ মুক্তির মহিমা থেকে বঞ্চিত থাকলো মানুষেরা। বরং নানামাত্রিক সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িকতা স্থান পেল রাষ্ট্রের নীতিমালায়। চর্চিত হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। ফলে মৌলবাদী চিন্তাচেতনা বিকশিত হলো সর্বত্র। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক

ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর করতলগত হলো। নব্বুয়ের দশকে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থাকলেও প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির অন্ধকারে পতিত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকেও সেই পতনের ধারাবাহিকতা বর্তমান। আর এ সময় যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর হিংস্র প্রকাশ। সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে তারা আক্রমণ পরিচালনা করেছে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের উপর। ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর জাতীয় সম্মেলনে গ্রেনেড হামলা চালায়। নিহত হয় দশজন। শতাধিক শিল্পী-কর্মী-শ্রোতা আহত হয়। সূচনা হয় মৌলবাদের ভয়াবহ হামলার। একের পর এক হামলা চলতে থাকে। ২০০৫ সালে নেত্রকোণা উদীচীতে হামলা হয়। নিহত হয় শিল্পীকর্মী হায়দার ও শেলী। আহত হয় অনেকে। মৌলবাদের গ্রেনেড হামলায় বারংবার থমকে গিয়েছে বাংলাদেশ। অধিকাংশ রাজনীতিবিদরা মৌলবাদী হিংস্রতাকে উপেক্ষা করলেন ক্ষমতার মোহে। কিন্তু উদীচী আক্রান্ড় হলো। রক্তাক্ত হলো। তবু পিছপা হলো না। হত্যা-হামলা কিংবা নির্দয় নির্দেশ উদীচীর আদর্শিক পথচলাকে করতে পারেনি বিঘ্নিত। বরং দীর্ঘ পথচলায় উদীচী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে শত সংগ্রামের অতন্দ্র সারথি।

উদীচীর দীর্ঘ চার দশকের পথচলা তার সৃষ্টির অঙ্গীকারে অন্নিষ্ঠ। আজ বিচ্যুতিহীন সংগ্রামী শিল্পী কর্মীর সমাবেশ উদীচী। ১৯৬৮ থেকে ২০০৮, এই চলিণ্ডশ বছরে বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে নানা সংকটাপন্ন সময়। বিপন্ন-বিবর্ণ হয়েছে কখনো কখনো। অথচ উদীচী অবিভাজিতভাবে দ্রোহ-সংগ্রামে এবং মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ মানুষের আত্মবলিদানের রক্তঋণে আবদ্ধ থেকে চলেছে সুনির্দিষ্ট গন্ড়ব্য। উদীচীর সাথে আছে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্তের অক্ষয় প্রেরণা, প্রিয়তম মাতৃভূমির প্রতি প্রবল প্রণয়, আদর্শ ও গন্ড়ব্যের ঠিকানা। তাই উদীচী অবিশ্রামী শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গণসংস্কৃতির অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। রেখেছে প্রার্থিত সমাজ নির্মাণের অপ্রতিহত দৃঢ় প্রযত্ন সংগ্রাম। চারদশকের সংগ্রামী উদীচীকে তাই সহস্র অভিবাদন।

*সহ সভাপতি, উদীচী, কেন্দ্রীয় সংসদ*

# একটি দুটি সহজ কথা

অলোক বসু

উদীচীর সাথে আমার সম্পৃক্ততা প্রায় বছর কুড়ির। অনেকেই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, সেজন্যে শুর“তেই বলে রাখা ভালো উদীচীর সাথে নিত্যদিনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল মাত্র আড়াই-তিন বছরের, বাকিটা অনুভবের। আশির দশকের শেষের দিকে উদীচীতে আসা আমার। তখন এরশাদশাহীর সামরিক স্বৈরশাসন চলছে দেশজুড়ে। উদীচীর সম্পর্কে আমার তেমন কোনো পূর্ব-ধারণাও ছিল না। হঠাৎ করেই পত্রিকার পাতায় কর্মী আহ্বানে সাড়া দিয়ে উদীচীতে যুক্ত হয়ে যাই। উদীচীর সাথে সেই সংযুক্তি আমার জীবনবোধ পাল্টে দিলো। পৃথিবীর পাঠশালায় আমি যদি উদীচী নামের ঐ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত হতে না পারতাম, তাহলে আমি নিজেকে আজ একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে ভাবতে পারতাম কিনা সন্দেহ? আমি জানি না কোন পরিচয়ে পরিচিত হতাম আমি? তবে আজ আমি যা (বিনয়ের সাথে বলছি আমি এমন কেউ নই যে আমার বিজ্ঞাপন করতে হবে), তার পেছনে উদীচীর অবদান অপরিসীম।

বিশেষ কোনো লক্ষ্য সামনে রেখে আমি উদীচীতে যাইনি। উদীচীতে গিয়ে আমি আমার লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি। সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন বুঝিবা তার কর্মীদেরকে উত্তর আকাশের তারা চেনানোর পাশাপাশি, আরো অনেককিছুই চিনিয়ে দেয়; যা আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, সৃজনশীল জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। আমার বিশ্বাস যিনি একবার উদীচীর সাথে নিজেকে করতে পেরেছেন বা পারবেন, তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

আমি কি উদীচী সম্পর্কে লিখতে বসে এর কর্মীদের জীবন যাপন বিষয়ে লিখতে শুর“ করেছি? না সেরকমটি করার ইচ্ছে আমার নেই। আসলে বড় বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালে এক একজনের মনে এক এক ভাব উদয় হয়। আগেই বলেছি আমি মাত্র আড়াই তিনবছর উদীচীতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করেছি। সেই সময়টা আমার জীবনের স্বর্ণসময়। প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষে অপেক্ষা করতাম কখন উদীচী অফিসে গিয়ে হাজির হবো। যতক্ষণে উদীচী অফিসে গিয়ে না পৌঁছতাম ততক্ষণে যেন পেটের ভাত হজম হতো না। খুব যে মনোযোগী, একনিষ্ঠ সংস্কৃতিকর্মী ছিলাম তা কিন্তু নয়, আসলে প্রিয় কিছু মানুষ, অবশ্যই তাঁরা উদীচীর নেতৃস্থানীয় কর্মী, তাঁদের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্যই উদগ্রীব থাকতাম সব সময়। আমি যে সময় এর কথা বলতে যাচ্ছি সেসময়টায় সবার মাঝে এত আন্তরিকতা, এত হৃদ্যতা ছিলো, যা আজ আর কোথাও পাই না। শুধু সেই স্মৃতির ধন যেন আজও

যক্ষেও ধনের মতো আগলে বেড়াচ্ছি। তাতে কোনো ক্লান্তি নাই বরং আছে দারুন এক প্রশান্তি। উদীচীর পরেও আমি অন্য দ'তিনটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছি কিন্তু ঐরকম হৃদ্যতা আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এত ভালবাসা মমত্ব আর কোথাও পাইনি। সকলকে নিয়ে যেন দ্বিতীয় পরিবারে বসবাস ছিল আমাদের। এখন উদীচী থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও সেসব দিনের কথা জীবনে কখনোই ভুলতে পারবো না। আমরা যেন বোধিবৃক্ষের নিচে বসে পাঠ নিচ্ছিলাম বৃহত্তর জীবনের। সেসময় উদীচীতে এসে যাঁদের ছায়ার অবস্থান নিয়েছিলাম তাদের অন্যতম সৈয়দ শহীদ। ছোটখাটো এই মানুষটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলেন। আমার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর অবদান এত বড় যে এই ছোট লেখা দিয়ে তার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। পরে সুযোগ হলে এ বিষয়ে অন্য কোনো জায়গায় লেখার চেষ্টা করা যাবে।

যা বলছিলাম, সৈয়দ শহীদ তখন উদীচীর আবৃত্তি বিভাগের নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার নেতৃত্বে আমরা মহড়ায় অংশ নিতাম। সৈয়দ শহীদ ছাড়া অগ্রজ আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনিমেষ আইচ, রাফুভাই, লিজাআপার নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতেই হয়। অনিমেষ আইচের কাব্যনাট্যরূপে আমরা তখন সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' নিয়ে সত্যি সত্যিই বিপণ্ঢবী। স্বরশ্রুতির আবৃত্তি উৎসব, শহীদ মিনারের একুশের অনুষ্ঠানসহ নানা অনুষ্ঠানে আমরা এর আবৃত্তি পরিবেশন করতে থাকলাম। 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' তখন আমরা ক্যাসেট রেকর্ড করে বাজারেও ছেড়েছিলাম। মনে পড়ে শিল্পী অশোক কর্মকার এই ক্যাসেটটির জন্য চমৎকার একটি ডিজাইন করেছিলেন। সেসময় 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'র আবৃত্তিতে যারা অংশ নিতেন তাদের সবার নাম এই মুহূর্তে মনে না পড়লেও অনেকের নামই মনে আছে। শহীদ ভাই, রেজাউল করিম, সিদ্দিক রানা ভাই, রাফুভাই, লিজাঅপা, অনিমেষদা ছাড়াও যারা আমরা উদীচীতে তখন যারা তরুণ তুর্কী তাদের মাঝে ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন নিপু, তৌফিক রহমান, নাফিজুল কাদীম, ফেরদৌস আলম, অঞ্জন রহমান, রেজা, জহির বিশ্বাস, মুমু এবং আমি নিজে। আমাদের এ প্রযোজনার জন্য সংগীত পরিকল্পনা করেছিলেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু। আর আমাদের এই কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে উদ্দীপনা যোগাতেন সানাউলণ্ঢাহ লাবলু, প্রণব, প্রমুখ। পরবর্তীতে আমাদের আবৃত্তি শাখায় গোপারিয়া থেকে এসে আরো যুক্ত হয়েছিলেন লায়লা তারন্নুম চৌধুরী কাকলী, ঝর্ণা সরকারসহ আরো অনেকে।

সৈয়দ শহীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য পরম পাওনা। স্থান ও সময় সংকটের কারণে আমাদেরকে মহড়া করতে হবে বিকেল ৪টা থেকে। সৈয়দ শহীদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি বিকেল ৪টা মানে ৩:৫৫ঠ। এই শিক্ষাটা আমি সারা জীবন ধরে পালনের চেষ্টা করে আসছি। আমি কতটা উপকৃত হয়েছি জানি না, তবে আমার জন্য সময়-ঘটিত কারণে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এমন মানুষ

পাওয়া হয়তো একটু কষ্টসাধ্যই হবে। এসব শিক্ষা যে, ব্যক্তি সৈয়দ শহীদের কারণে হয়েছে তা নয়, এর পেছনে নিঃসন্দেহে উদীচীর আর্দশিক এবং কমিটমেন্টের জায়গাটাই মূল বিবেচ্য। উদীচীর সেই আর্দশের কিছুটা জ্যোতি হলেও আমাদের স্পর্শ করতে পেরেছিলো। তাই আজ গর্ব করে বলতে পারি আমরা জ্বলে উঠতে না পারলেও নিভে যাইনি। আমাদের সময়কার উদীচীর অনেক বন্ধুই আজ সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

আমরা উদীচীতে এসে বিশিষ্ট আরা যাঁদের সংস্পর্শ পেয়েছিলাম তাঁরা হলেন কলিম শরাফী, পান্না কায়সার , যতীন সরকার, হায়াৎ মমুদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, গোলাম মোহাম্মদ ইদু, মফিদুল হক, তানভীর মোকাম্মেল, আখতার হুসেন প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন আমাদের কাছে পরশ পাথর। একটু ছোঁয়া পেলে আমরা লোহা সোনায় (নাকি গাধা থেকে ঘোড়ায়!) পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। মাহমুদ সেলিম, রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা, সৈয়দ শহীদ, সানাউলণ্ঢাহ লাবলু সেন্টু রায়, হেলেন করিম এরাইবা কম কিসে? এরা যেন আমাদের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন সামনে এগিয়ে যেতে। শুধু কী তাই? মোফাখখার ল ইসলাম জাপান, শাহজামাল তোতা, শিবানী ভট্টাচার্য, ধীরেশ নাগ, অলক দাশগুপ্ত, মাহবুব, ফজলুর রহমান বাবু, বিদুৎ, মহীতোষ তালুকদার তাপস এরাতো এসে রীতিমতো হাত ধরে এগিয়ে নিয়েছেন। আমাদের পরে এসে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ঢাকার দুই দিকের দুই তর ণ জ্যোতিষ্ক, উত্তরের তেজগাঁও উদীচীর হাবিব আর দক্ষিণের গেন্ডারিয়া উদীচীর মানজার ল ইসলাম সুইট। তখন লালবাগও প্রায় বাঘের গর্জনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুক্ত হয়েছেন রতন সিদ্দিকী। প্রতিটি সন্ধ্যা কী চমৎকার সৃজনশীলতায়, মননশীল আড্ডায় কেটে যেতো। বিগত দুই দশক ধরে সেই আড়াই-তিন বছরের সুখস্মৃতির বয়ে বেড়াচ্ছি। সৃজনশীলতায়, মননশীল আড্ডায় কেটে যেতো। বিগত দুই দশক ধরে সেই আড়াই-তিন বছরের সুখস্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি। সারজীবন ধরে এই সুখ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে যাক। উদীচীর একজন এই পরিচয় দিয়ে বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক ফোঁটা শিশির হয়ে আমিও যুক্ত হয়ে নিজে ধন্য হতে চাই। আমি উদীচীর ছায়ায় আছি, এই শীতল-কোমল আনন্দই বা আমার মতো সাধারণ কটি মানুষের জীবনে ঘটে?

*এই স্মৃতিচারণমূলক লেখায় হয়তো ভুলক্রমে কারো নাম বাদ পড়ে যেতে পারে, যদি সেরকম ঘটে থাকে, তার দায় দায়িত্ব আমার, সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।*

# উদীচীর ৪১ বছর ঃ পেছন ফিরে দেখা

হাবিবুল আলম

দেশের বৃহত্তম সুশৃংখল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। ২৯ অক্টোবর ২০০৯, বর্ণময় ৪০টি বছর পেছনে ফেলে ৪১ বৎসর পূর্ণ করছে উদীচী। ৪০টি বৎসর ধরে ধারাবাহিক সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উদীচী আজ সারা দেশে একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ৪০ বৎসরে হাজার শিল্পীকর্মীর শ্রম, ঘাম, মেধা আর ত্যাগ উদীচীকে করেছে বলিষ্ঠ ও মহীয়ান। জন্মোৎসব লগ্নে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও লাল সালাম।

১৯৬৮ তে শিল্পী সংগ্রামী কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন সেনের হাত ধরে যাত্রা শুরু উদীচীর। আজ দেশের ৬০টি জেলাসহ থানা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে দু'শতাধিক শাখা কাজ করে চলেছে একযোগে। সক্রিয় সংগঠন রয়েছে বিদেশেও। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ায় জোরালো কার্যক্রম চলছে উদীচীর। শোষণমুক্ত হাসি-গানে মুখরিত বাংলাদেশ গড়া উদীচীর জন্মের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দশ সহস্রাধিক শিল্পীকর্মী উদীচীর পতাকাতলে আজ সুসংগঠিত। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে দেশ আজ ভয়াবহ সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসরমান। হাজার বছরের ঐতিহ্যে ঘেরা বাঙালি সংস্কৃতি আজ হাবুডুবু খাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া বিদেশী/পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জোয়ারে। তারা সুকৌশলে কিনে নিচ্ছে আমার দেশের গ্রামীণ ঐতিহ্য এবং শিল্পীকর্মীদের। স্পনসরের বেড়াজালে আবদ্ধ করে আমার সংস্কৃতিকে পণ্য বানিয়ে চালাচ্ছে রমরমা ব্যবসা। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সামনে ছুড়ে দিচ্ছে ভোগ বিলাসের আকাশচুম্বি স্বপ্ন। সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে অন্ধের মত ছুটছে। আজ যে কোন উপায়ে স্বল্প সময়ে ধনী বনে যাবার নেশায় আসক্ত দেশের তরুণ-যুবকেরা, সকাল থেকে গভীর রাত এই কাজ সেই কাজ আরো কত কি। সংগঠন করা তো দুরের কথা। ব্যক্তি হিসেবে জীবনের নিজস্বতা কেড়ে নিচ্ছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা নিজের খবর রাখার সময় নেই। সংগঠনের সাথে যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যেও অনেককে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভোগবাদী বিলাসী চিন্ড্র করতে। কষ্ট করে, ত্যাগ স্বীকার করে সংগঠন করা তাদের কাছে অবান্ড্র। পরিশ্রম না করে সবকিছু পয়সার বিনিময়ে কাজ সেরে ফেলার এক ধরনের মানসিকতা আজ ছিড়ে খাচ্ছে সংগঠনগুলোকে। এ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ফসল। উদীচীর মতো প্রগতিশীল সংগঠনগুলোকে নস্যাৎ করতে সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন কৌশলী ফাঁদ পেতে আছে। তারা সংগঠন ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী এ হীণ তৎপরতা সফলতা পাচ্ছে কেন? আদর্শবাদী ত্যাগী সচেতন সংগঠকের মারাত্মক অভাবের কারণেই আজকের এ দশা। এ কথা

অনস্বীকার্য। এখনই প্রয়োজন ত্যাগী আদর্শবাদী সংগঠক তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন।

এমনতো ছিল না! একটু পেছন ফিরে যদি তাকাই তাহলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে আমাদের সোনালী অতীত। মুকুন্দ দাস, রমেশশীল, শাহ আব্দুল করিমরা বিপণ্ঢবী হয়ে তৈরি হয়েছিলেন মানব মুক্তির আদর্শে আদর্শিত কিছু সংগঠকের ছোঁয়ায়। শুধু তারাই নয় সেই সব সংগঠকের হাতের ছোয়ায় মানব মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত হয়েছিল শত সহস্র প্রাণ। কই আজতো দেখছি না আরেকজন মুকুন্দ দাস, রমেশশীল, নিবারন পন্ডিত। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। এই যে আমরা, আমাদের ক্ষুদ্র সাংগঠনিক জীবনে যা দেখেছি তা এখন বিস্ময়কর! আজ আমরা যতখানি তার পুরোটাই দক্ষ কোন সংগঠকের হাতের ছোঁয়ায় হয়েছে। আজ কেন হচ্ছে না? তাহলে কি বলব পুরোপুরি দক্ষ সংগঠক হয়ে উঠতে পারিনি আমরা। হ্যা এটাই সত্যি। আমরা নিজ হাতে কত না লিখেছি, পোস্টার সাটিয়েছি দেয়ালে। শিল্পী বন্ধুরা নিজ হাতে লিখেছে ব্যানার যাতে ছিল শিল্পের ছোঁয়া। রাতের পর রাত দেয়ালে লিখেছি। পায়ে হেঁটে বাসে চড়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি পত্রিকা অফিসে। তুলেছি গণচাঁদা। অনুষ্ঠান হলে সাজ সজ্জার কাজ রাত জেগে নিজেরাই করেছি। দূর দূরান্ডে চলে গেছি গানের দল নিয়ে, নাটকের দল নিয়ে অনুষ্ঠান করতে। তাও বিনে পয়সায়। কাজের মধ্যে দিয়ে একে অপরের কাছে হয়ে উঠেছিলাম আত্মার আত্মীয়। অগ্রজদের নির্দেশেই করেছি এতসব। অগ্রজদের দেখেছি আমরা গুরুর আসনে। তবে হ্যাঁ। সকলেই যে টিকতে পেরেছে তা নয়। ভোগবাদী বিলাসী সমাজ ব্যবস্থার টানে কিছু আবার লাইনচ্যুতও হয়েছে। সে কথা থাক। নব প্রজন্মের কর্মী বন্ধুদের আজ যদি বলা হয় সে সব কথা তাহলে হতবাক হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে প্রশ্নও ছুঁড়ে দেয় "এও কি সম্ভব?" তারা হয়তো মনে মনে হাসে আর বলে ডিজিটালের এই যুগে এগুলো ভাবাই অবান্ডব। কিন্তু নব প্রজন্মের বন্ধুদের বলতে চাই দক্ষ, সৎ, আদর্শবান ত্যাগী কর্মী সংগঠক হবার এটাই পথ। যুগে যুগে এভাবেই আদর্শবান নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা সত্য যে নতুন প্রজন্মের কর্মী বন্ধুদেরকে বুঝানোর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে, রয়েছে যোগ্যতার সীমাবদ্ধতাও। কর্মী সংকটের তীব্রতা বাড়ছে এজন্যই হয়তো। এ ব্যাপারে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। যুগোপযোগী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। তা না হলে অনেক বড় খেসারত দিতে হতে পারে জাতিকে।

৪১ টি বছর পার করল উদীচী। একটা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য এটি অনেক বড় বিষয়। আমাদের লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তা মূল্যায়ন করার সময় এখনই। আমরা জানি কী আমাদের জন্মের অঙ্গীকার। সে অঙ্গীকার পূরণ করতে উদীচীকে শোষিত অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। আর সেটা সম্ভব হবে কলে-কারখানায় গ্রামে-গঞ্জে শ্রমিক এলাকায় উদীচীর শাখা

গঠন করার মধ্য দিয়ে। শুধু শাখা গঠন করলেই চলবে না। দরকার দক্ষ, ত্যাগী, সৎ, নিষ্ঠাবান, আদর্শবান কর্মী বাহিনী, যাদের হাতের স্পর্শে পাল্টে যাবে এ ঘুনে ধরা সমাজ। আমাদের উচিত সে রকম একটি কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা। আর তা করতে হলে যা সবচেয়ে জর"রি তা হল নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে বেশি বেশি অনুষ্ঠান করা, মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়া। হতাশা আমাদেরকে গ্রাস করতে পারবে না। আমরা এগিয়ে যাবোই। কোন বাঁধাই আমাদেরকে র"খতে পারবে না। কারণ আমরা পেছন ফিরে দেখতে শিখেছি। আর পেছনের বিপণ্ঢবী ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিয়েছি। উদীচীর জন্মের অঙ্গীকার শোষণমুক্ত সমাজ আমরা গড়বোই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

জয় উদীচী
জয় হোক কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনতার।

# উদীচীর নাটক - অন্য মাত্রায়, অন্য চিন্ড়ায়

আরিফ হায়দার

১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর কমরেড সত্যেন সেনের প্রতিবাদী একটি শব্দ 'উদীচী'। আজ এই শব্দটি শোষক শ্রেণী মানুষের কাজে এতটা ভয়ের হয়ে উঠবে তখন কেউ ভাবতে পারেনি। সত্যেন সেন শুধুই একজন মানুষ নন - তিনি একজন পথ হারানো মানুষের পথ দেখানো মানুষ। যার মধ্যে কোনো চাওয়া পাওয়া ছিলোনা - ছিল শুধু সুন্দরভাবে দেখার একটি চোখ। সেই চোখের মধ্যে হাজারো প্রশ্নের উত্তর আজো দেয়ালে লাগানো ছবির মধ্যে খুঁজে ফিরি।

যে মানুষটি সমাজের জন্য দেশের জন্য সারাটা জীবন দিয়ে আদর্শের পথ দেখালো সেই পথে আজ আমরা কত জন? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি কি - তার পথ চলা পথে ঠিক ঠাক হাটতে পারছি কিনা। নিজের বিবেকের কাছে একটু একা-একা প্রশ্ন করলে মাথা নিচু হয়ে যায়। তখন পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকি এবং নিজের অপরাধে মনে হয় - আমি কোন পথে চলেছি। এই পথ চলার কথা কি আমার? আমি তো সত্য মানুষের পথ ধরে হাটতে শিখেছি। একদিন যে আমাকে একপা একপা করে হাটতে শিখিয়েছে আর প্রতিটি পদক্ষেপে বলেছে সাবধানে পা ফেলো - সাবধানে পা ফেলো.....।

অথচ আজ কোন জলাভূমির সামনে দাঁড়িয়ে এতো বড় বড় কথা বলছি বড় বড় নেতার মতো বুলি আওড়াচ্ছি। আসলে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। একটি মানুষের শব্দের কাছে যাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। উদীচী শব্দটি নিয়ে কারো অধিকার নেই নিজের ব্যক্তি সম্পত্তি বানানোর। সত্যেন সেন এই জাতির একটি গর্ব। যাকে অর্থ দিয়ে কেনা-বেচা করা যায়না। আমরা আশা করবো এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে হাজার মানুষের শরীরের ঘাম, ধুলো বাতাসের শ্বাস - প্রশ্বাস। আর এখন সেই শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে একটু একটু করে যদি আমাদের বর্তমান সমাজের তর"ণদের একটুও ছিটেফোঁটা লাগে তবে ফিরে পাবো আদর্শে বেঁচে থাকার সাহস।

এমনি করেই হয়তো শরীরে একফোঁটা ঘাম এসে পড়েছে উদীচীর এক ঝাঁক তর"ন-তর"ণীদের শরীরে। তাইতো বিস্ড়ার করেছে সমগ্র বাংলাদেশে। আজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় উদীচী মানেই জীবনের কথা, জীবনের গান, বেঁচে থাকার সুর। খেয়ে না খেয়ে ঢোল-করতাল-হারমোনিয়াম নিয়ে বেঁচে থাকার, যুদ্ধের, স্বপ্ন দেখার গান গাইছে, মুখে সংলাপ ছুড়ছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা । আশ্চর্য হয় যখন উদীচী রাজপথে এসে সত্যের জন্য প্রতিবাদ করে। শুধু গান নয়, কথায় নয়,

বক্তৃতায় নয় - একটা গল্প, জীবনের গল্প নিয়ে শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গি দিয়ে রাজপথে সাধারণ মানুষের সামনে নাটক করছে। উদীচী নাটক করছে, শুধু পথে নয় মঞ্চেও। একে একে কড় গুনে দেখা যায় হিসাবের খাতায় অনেকগুলো নাটক জমা হয়ে গেছে। যেমন - আলো আসছে (১৯৭৮), জীবন তরঙ্গ (১৯৭০), সাধের একতারা (১৯৭৭), হইতে সাবধান (১৯৭৮), নরক গুলজার (১৯৮২), মিছিল (১৯৮৪), ধলা গেরামের নাম (১৯৮৪), অভিশপ্ত নগরী (১৯৯২), চিরকুমার সভা (১৯৯৩), বিবাহ উৎসব (১৯৯৫), শুভ্রতিমির (১৯৯৭), চিলেকোঠার সেপাই (১৯৯৯), দ্য ফ্রিডম অব দি সিটি (২০০১), বৌবসন্ড্রী (২০০৪), ক্ষতবিক্ষত (২০০৮), হাফ আখড়াই (২০০৯)। এছাড়া পথনাটক হিসেবে কয়েকটি নাম বলা যায় - সাচ্চা মানুষ চাই (১৯৭২), ইতিহাস কথা কও (১৯৭৭), দিন বদলের পালা (১৯৮৯), রাস্ড়য় বসে রাস্ড়র কথা (১৯৮৯), তেভাগার পালা (১৯৮৯), গনি মিয়ার কিসসা (১৯৯০), রাজাকারের পাঁচালী (১৯৯১), ইঁদুরের কিচ্ছা (১৯৯১), একজন গনি মিয়ার সংবাদ (১৯৯১) ঈশ্বরের আদালত (১৯৯৩), মাদারীর খেল (১৯৯৩), বর্ণচোর (১৯৯৪), ঠোলার পাঁচালী (১৯৯৪), রাজা ও রাজদ্রোহী (১৯৯৫) স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৯৫), দেয়ালের লিখন (১৯৯৭) ইত্যাদি।

মঞ্চনাটক, পথনাটক নিয়ে উদীচী যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। উদীচী নামটি বাংলাদেশের কৃষক থেকে শুর“ করে আকাশ ছোঁয়া মানুষগুলোও জানে। সেই উদীচীকে অন্য কোন সংগঠনের সদস্য হতে হবে তাও আবার নাটকের জন্য। সত্যিই দুঃখ পেয়েছি। কারণ যে উদীচী মাথা উঁচু করে এতাগুলো নাটক প্রযোজনা করতে পারে তার আবার দায় কোথায়। উদীচী একটা ইনস্টিটিউশন। যেখানে থাকলে মানুষের মতো মানুষ হয়ে কিছু শেখা যায়। আর তাই বারবার বাঁধা দেয় একটা অদ্ভূত কালো ছায়া এবং মৃত্যু ডেকে আনে চোখের পলকে। তরাপরেও উদীচী পিছে ফেরেনি - এগিয়ে চলছে মানুষের স্বত আদর্শ নিয়ে।

উদীচীর নাটক বিভাগ এর কাজ শুধু ঢাকা কেন্দ্রীক না করে বাংলাদেশের প্রতিটি শাখায় প্রাণ বিস্ড়র করতে পারলে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে একটা অন্যরকম ধাক্কা দেবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং সেই সাথে ঢাকার প্রযোজনাগুলো দেশের প্রতিটি উদীচীর শাখার আয়োজনে যদি প্রদর্শনী করার প্রক্রিয়া করা হয় তবে উদীচীসহ অত্র জেলার সাধারণ মানুষরা জানতে পারবে বর্তমান সমাজের কথা নাটক দিয়ে উদীচী কি করে ভাবছে। তবে এটা সকলেই বিশ্বাস করে উদীচীর সকল কর্মীদের ভাবনার ভাষাটা আর দশজনের মতো নয়। মানুষের বিপদে ছুটে আসে রাতের অন্ধকারে, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় কোন কিছু না ভেবে। এ যে সত্যেন সেনের কর্মী। কোন বাধাকে স্বীকার করেনা। তাই কোন বাধাকে স্বীকার না করে পথে-মঞ্চে সত্য ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দল উদীচীর নাট্যকারের কলমে লেখা ঝড়ো সংলাপে।

তর ণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যখন মঞ্চের পাদোপ্রদীপের আলোতে ঝড়ো সংলাপ তখন দর্শক সারিতে ঠাঁয় বসে থাকা চোখগুলো তাকিয়ে দেখে শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গি আর দু কান উত্তপ্ত হয় সংলাপের ধারালো প্রক্ষেপণে।

উদীচীর নাটক অন্য মাত্রায়, অন্য চিন্ড্রয় নির্মাণ করে অন্য আরেকটি ছবি - সত্যের ছবি।

নাট্যকার, নির্দেশক

# রুখে দাঁড়াতে হবে

জামসেদ আনোয়ার তপন

আফগাানিস্তানে নব্বই এর দশকে ড. নজিবুল্লাহর নেতৃত্বে একটি বিপ-বী সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় এসে সে সরকার যথার্থই বিপল্পবী কর্মসূচী গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, তার একটি হল কৃষি ও ভূমির ক্ষেত্রে। দেশের বেশির ভাগ আবাদী জমি ছিল মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদারদের হাতে। সেই সামন্ত প্রভুদের, যাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন তূমিকা ছিল না, তাদের কাছ থেকে সব জমি উদ্ধার করে তা প্রকৃত কৃষকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে জমি ও ফসল যেন জমিদারের গুন্ডারা কেড়ে নিতে না পারে সে জন্য সরকার কৃষকদের হাতে বন্দুক দিয়েছিল। জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাধা আসলো খোদ কৃষকদের তরফ থেকে। কোথাও কোথাও কৃষকরাই বললো, এই জমির মালিকানা জমিদারদের, কাজেই জমির উপর  আমাদের হক নেই। যে জমিতে হক নেই সেটা যদি ভোগ করি তাহলে আল্লাহ্ নাখোশ হবে। তারা জমিতে যেতে চাইলো না।

বাংলাদেশে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নারী উন্নয়ন নীতি কার্যকর করা যয়নি শুধু মাত্র মৌলবাদীদের বাঁধার কারণে নয়, সাধারণ মানুষদের সমর্থনও এর প্রতি লক্ষ্য করা যায়নি। বহু নারীকেও এ নীতির বিরুদ্ধে বলতে শুনেছি। যুগ যুগের পশ্চাৎপদতা কুসংস্কার,সাম্প্রদায়িক ও পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা মানুষের মগজের কোষে কোষে বাসা বেঁধে রেখেছে। কোন নতুন চিন্তা তা সে যতই মানবিক হোক না কেন গ্রহণ করতে দিতে চায় না সনাতন মন। এ সংকট প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতির সংকট বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের স্বর্ণালী অতীতের কথা আমরা জানি। প্রতিটি আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে সংগঠকদের  কী অপরিসীম ত্যাগই না করতে হয়েছিল। তেভাগা, টংক, নানকার, আন্দোলনের উজ্জ্বল বীরত্বগাঁথা আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাসের অংশ। সেই আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের অবদানের কথাও আমরা জানি।

মাঠে মাঠে সোনালী ধান
আমরা হিস্যা নাই সেই ধানে.....
তোরা আমার জমিন কাইড়া নিছস জমিন ফিরা দে
দেখ্ আমরা সবাই এক হইয়াছি রক্ষা নাইরে......

সত্যেন সেন কী অপরিসীম মমতা দিয়ে কৃষকদের দু:খ দুর্দশা আর সংগ্রামের চিত্র অংকন করেছেন তার 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' 'বিপ-বী রহমান মাষ্টার' ইত্যাদি

গ্রন্থে। কিন্তু আজ এক বিপরীত বাস্তবতা আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। গড্ডালিকা প্রবাহে আমরা যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আজ স্বাধীন দেশে যখন দেখি কানসাটে বিদ্যুতের দাবিতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন দমনে পুলিশের গুলিতে পাখির মত কৃষক নিহত হয় তখন কি আমরা সেই কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি? কয়টি গান, কবিতা রচনা করেছি সেই আন্দোলনের সমর্থনে? ফুলবাড়িয়াতে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনির ফলে বাস্তুভিটাচ্যুত হবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনে বহুজাতিক কোম্পানির তাঁবেদার পুলিশ যখন মানুষ হত্যা করে তখন আমাদের কলম দিয়ে কটি গান কবিতা নাটক রচিত হয়েছে? গামেন্টে নির্মম শ্রম শোষণের শিকার হয়ে যখন নিঃশেষ হয়ে যাচেছ শ্রমিকের প্রাণ তখন সেই শ্রমিকের বেদনাকে কতখানি নিজের বলে অনুভব করেছি। আজ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। যখন দেখি একটি মার্সিডিজ গাড়ির কাছে বিক্রি হয়ে যায় দেশের মন্ত্রী, এমপি আর আমলাতন্ত্র। অনায়াসে গ্যাস চলে যায় বহুজাতিকের মুনাফার থলিতে। তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহসটা পর্যন্ত আমাদের যদি না থাকে তবে আমাতে আর বিড়ালে তফাৎ কী? লোভের কাছে, টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমগ্র অর্জন। 'খাও দাও ফুর্তি কর' কিংবা 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' এই সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের সকল মুল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। লুটপাট করে হোক, অন্যায় করে হোক যে ভাবেই পারি বড়লোক বনে যাই এই হচ্ছে আমাদের দর্শন। এ দর্শন প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে মিডিয়া, চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যম আজ বিকৃত রুচির কিছু লোকের করতলগত। চলচ্চিত্রের দুর্বত্তপনা এখন আর শুধু সিনেমা হলে আটকে নেই, চলে এসেছে ঘরের ভিতর। টেলিভিশনে, নাটকের ছদ্মবেশে। মানুষকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ভোগবাদি পরজীবীতে পরিণত করার জন্য এই মিডিয়াগুলো কাজ করছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু তারা টিকতে পারছে না। পুঁজিবাদী হাঙ্গর মানুষের সকল সুকুমার বৃত্তিকে গিলে খাচ্ছে। এখন আমরা গল্প উপন্যাস, নাটক লিখি সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে কোটিপতি হওয়ার ধান্দায়। মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সেখানে স্থান নেই। সমাজ বদলের চিন্তা পরিত্যাক্ত।

তাহলে উপায় কী ? কী করে বাঁচবো আমরা এই হাঙ্গরের করাল গ্রাস থেকে ?

বাঁচবার উপায় একটাই। রুখে দাঁড়ানো। একা নয়, ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াইটা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। তরুনদের আজ সেই দায়িত্ব নিতে হবে। যেমন নিয়েছিল ৫২, '৭১ কিংবা নিকট অতীত নব্বই।

# সংস্কৃতির সংগ্রামে উদীচী

অমিত রঞ্জন দে

চিন্ড্র ছাড়া যেমন সভ্যতার কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে চিন্ড্রর মূল বাহন হল ভাষা। ভাষাই মানুষকে মানুষরূপে আবিষ্কার করেছে। তাকে চিনিয়েছে আপন ঠিকানা। ভাষাসহ নিরন্ড্র জীবনসংগ্রাম জন্ম দিয়েছে গণসংস্কৃতির আর এই গণসংস্কৃতিচর্চা এবং শিল্পকর্মে শোষণমুক্তির ঐতিহাসিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় উদীচী। দেশে তখন বিরাজ করছে পাকিস্ড্রনী শাসন। দেশের সিংহভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহলের দখলে। ধর্মান্ধতা, কুপমন্ড়ূকতা গ্রাস করে ফেলেছে গোটা জাতিকে। দেশব্যাপি চলছিল নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, নজরুলকে করা হয়েছিল দ্বিখন্ডিত, বাঙালিত্বের চেনতাকে করা হয়েছিল নিষ্পেষিত, ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম হয়েছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর।

ধর্মান্ধতা ও কূপমন্ড়ূকতার কুয়াশা ভেদ করে মানুষকে জাগানোর জন্য, ঘুম ভাঙানোর জন্য, তাদেরকে বৈপণ্ঢবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে, কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলতে এবং গোটা জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবার লক্ষ্যে শিল্পীসংগ্রামী সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, গোলাম মোহাম্মদ ইদু, সাইদুল ইসলাম, মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান, কামরুল আহসান খান প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। গঠনপর্বের প্রাকমুহূর্তে শিল্পী সাইদুল ইসলামের নারিন্দার বাসায় ৬-৭ জন শিল্পী-কর্মী একত্রিত হয়ে মহড়া শুরু করেন 'ওরে ওরে বঞ্চিত সর্বহারা দল।'

গণসঙ্গীতই উদীচীর প্রাণ। তার পাশাপাশি পালণ্ঢা দিয়ে চলেছে নাটক। ৬৮ সালেই উদীচী মঞ্চস্থ করে মঞ্চনাটক 'আলো আসছে'। এ নাটকের মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর দোদুল্যমান চরিত্রকে তুলে ধরা হয়। সেই থেকে অবিরাম পথ চলা। কখনো কখনো শুত্রুর চোখ রাঙানি, বুলেট, বোমা থামিয়ে দিতে চেয়েছে উদীচীর কর্মকান্ড। কিন্তু সত্যেন সেনের সঞ্জীবনী সঙ্গীত 'মনুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী তাই দিয়ে রচিত গান মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাব মানুষের দেয়া প্রাণ' তাকে আবার প্রাণিত করেছে। শিল্পী-কর্মীরা ছুটে গেছে মানুষের মাঝে। মানুষ জাগানোর জন্য, মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য, বৈপণ্ঢবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পরিবেশন করেছে গণসঙ্গীত ও নাটক।

তাইতো গণঅভ্যুত্থানে উত্তাল, রক্তাক্ত, আসাদের রক্তে ভেজা ঊনসত্তরেও থেমে থাকেনি উদীচীর শিল্পীকর্মীরা। আসাদের মৃত্যুর সপ্তাহখানের মধ্যেই উদীচী পথে

নামল গণসঙ্গীত ও নাটক নিয়ে। রাস্ড়য় তখনো পুলিশের লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস। কিন্তু সেসব উপেক্ষা করেই উদীচীর তর"ণ কর্মীরা রাস্ড়য় রাস্ড়য় পরিবেশন করেছে গণসঙ্গীত আর মঞ্চস্থ করে চলেছে নাটক 'শপথ নিলাম'। রাস্ড়র মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে, কখনো কখনো ট্রাকের উপর া সারা দেশের কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সঙ্গীত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য, দেশ গড়ার সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

উদীচী সোচ্চার থেকেছে শিল্পী-কর্মীদের বিভিন্ন দাবিতেও। শিল্পী-কর্মীদেরকে তখন অনুষ্ঠান করতে হলে প্রমোদ কর দিতে হত। যা হয়ত বর্তমান প্রজন্মের কর্মীরা জানেন না। ছিল না অনুষ্ঠান করার মত কোন জায়গা। '৭৪-এ উদীচীর সভাপতি সত্যেন সেন, সহ-সভাপতি মোস্ড়ফা ওয়াহিদ খান, সাধারণ সম্পাদক ইকরাম আহমেদ, নাট্যসম্পাদক ইকবাল আহমেদসহ উদীচীর কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যান। সেখানে তাঁরা দাবি উত্থাপন করেন প্রমোদ কর মওকুফ করতে হবে এবং রেসকোর্স ময়দানে নাটকের জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি করে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁদের এ প্রস্ড়াব গ্রহণ করেছিলেন। পরের দিন পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল নাটকের উপর কর মওকুফ করা হলো এবং রেসকোর্স ময়দানে উন্মুক্ত মঞ্চ করার জায়গা দেওয়া হল (বর্তমানে যেখানে শিশুপার্ক)। বর্তমানে যে জায়গায় উদীচী কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে জায়গাটিও বঙ্গবন্ধু উদীচীকে ব্যবহারের অনুমোদন দেন।

তারপর এলো' ৭৫ এর সেই ভয়াল রাত। বঙ্গন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে খুন করা হলো। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি দেশটাকে দখল করে নিল। স্বাভাবিকভাবে উদীচীর কাজেও বিঘ্ন ঘটলো। কিন্তু পালিয়ে বাঁচতে জানে না উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা। অচিরেই সংগঠিত হলো। '৭৫ এর আগস্ট থেকে '৭৬ এর একুশ। মাত্র ৬ মাস। সারাদেশ তখনো স্ড়ব্ধ, মুক। কেউ কোনো কথা বলে না। উদীচীর শিল্পীরা একুশের অনুষ্ঠানে গান ধরেছে। সুকান্ড় ভট্টাচার্যের কবিতা থেকে গান 'এদেশ বিপর্ন্ন আজ' পরের গান সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে, 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।' পরের গান 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্ড়নে' ইত্যাদি।

তার পরপরই মাহমুদ সেলিম রচনা করলেন আরেক সাহসী গীতিআলেখ্য 'ইতিহাস কথা কও'। স্ড়ব্ধতাকে প্রবল বেগে নাড়া দিতে ১৯৭৬-এর ১৬ ডিসেম্বর উদীচী পথে নামল গীতি আলেখ্য 'ইতিহাস কথা কও' নিয়ে। যার মধ্যে সন্নিবেশিত হয় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। অত্যন্ড় সাহসী সে প্রযোজনা। তারপর সেন্টু রায় রচনা করলেন 'দিন বদলের পালা'। ১৯৭৭ একুশে ফেব্র"য়ারিতে রমনা বটমূলে পরিবেশিত হলো গীতিনৃত্যনাট্যাআলেখ্য 'জানি রক্তের জোয়ারে জাগবে সুখের বান'। সেখানে ফাঁকা মঞ্চে ৬ ফুট উচ্চতায় একটি খালি মাইক্রোফোন রেখে বঙ্গবন্ধুকে প্রতীকীভাবে

উপস্থাপন করা হলো। সমান্ড্রালভাবে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের নির্বাচিত অংশ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

কিন্তু বাঙালির ইতিহাস ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এক কালো অধ্যায় থেকে জন্ম নেয় আর এক কালো অধ্যায়ের। একের পর এক ক্ষমতায় আসীন হতে থাকে সামরিক সরকার। তারা গণতন্ত্রকে গলা টিকে হত্যা করে। এসময় উদীচীকে সহ্য করতে হয়েছে নানা ধরনের উৎপীড়ন। তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম হাতিয়ার যাত্রাশিল্পকে নষ্ট করার অভিপ্রায়ে তারমধ্যে অত্যান্ড় সুকৌশলে প্রবেশ করানো হয়েছে অশণ্টীল নৃত্য। সামরিক সরকারের বুটের তলায় জনগণকে পিষ্ট করে মদদ যোগানো হতে থাকে উগ্র মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা। বপন করা হয় সংস্কৃতি ধ্বংসের বীজাণু।

উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা এই বৈরী স্রোত র"খে দাঁড়িয়েছে বার বার। ১৯৭৮ সালে দেশে ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদেও রাস্ড়ায় নেমেছে নৃত্যনাট্য 'প্রতিরোধ' নিয়ে। আবার স্বৈরশাসক এরশাদের দমন-পীড়ন, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেও সাংস্কৃতিক কর্মকা" অব্যাহত রেখেছে। তবে এ সময় শিল্প-সৃষ্টির তাগাদা যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল সময়ের দাবি পূরণ করা। সালাম বয়াতী লিখেছেন 'বড়গাঙ্গে শাসনতন্ত্র' দীলিপ দে রচনা করেছেন 'কুহুকুহু ডাক শুনিয়া' মাহমুদ সেলিম 'নতুন জংলি ড্রেস পরব মোরা' আমি মীরজাফর আলী (প্যারোডি), 'আমার ভাগার সময় হলো' ফজলুর রহমান বাবুর 'কথা কইলে হেয় চেইত্যা যায়' ইত্যাদি বহু গান এ সময় রচিত হয়েছে।

এরশাদ পতনের পর পরই শহীদ জননী জাহানার ইমাম এর নেতৃত্বে শুর" হয় যুদ্ধাপরাধবিরোধী অভিযাত্রা। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালালদের বির"দ্ধে গোটা জাতিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। উদীচী সে আন্দোলনেরও সামনে থেকে গতি সঞ্চার করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরী মঞ্চগুলোতে উদীচীর শিল্পীকর্মীদের পরিবেশিত গান, নাটক ছিল আন্দোলনকারীদের প্রেরণার উৎস।

এ ভূখ"ের মানুষের যেমন ইতিহাস তৈরির ঐতিহ্য রয়েছে তেমন রয়েছে ইতিহাস বিকৃতির নোংরা স্বভাব। একশ্রেণীর মানুষ সর্বদা এ ধরনের ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে লিপ্ত থেকেছে। ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ড় হয়নি ঘাতকেরা। ১৯৯৩ সালের দিকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও শুর" করে নানা চক্রান্ড়। তাঁকে নিয়ে রীতিমত শুর" হয়ে গিয়েছিল নোংরা রাজনীতি ও নানা ধরনের বিতর্ক। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করা শুর" হয়েছিল। এর বির"দ্ধে উদীচী রাস্ড়ায় নামে ব্যাঙ্গাত্মক নাটক 'ঈশ্বরের আদালত' নিয়ে, রচনা করে অসংখ্য গান। ১৯৯৬-এ সারা দেশের শিশু-কিশোরদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর লক্ষ্যে

অষ্টম-নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আয়োজন করে স্বাধীনতার ইতিহাস প্রতিযোগিতা।

উদীচী সকল অন্যায়-অবিচার, কুপুমণ্ডূকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং প্রগতির পক্ষে লড়াইয়ে সবার আগে সোচ্চার হয়েছে। অন্ধকারের শক্তি বারবার আঘাত হেনেছে উদীচীর উপর। স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে প্রগতির চাকা। ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে বোমা মেরে কেড়ে নিয়েছে ১০ জন শিল্পী-কর্মীকে, ২০০৫ সালে আত্মঘাতী বোমা হামলা করে হত্যা করে নেত্রকোনা উদীচীর হায়দার ও শেলীকে। এখনো বিভিন্ন জায়গায় চলছে নানামুখি হামলা, অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া, চোখ রাঙানি। কিন্তু ধর্মান্ধ মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যতই চক্রান্ত করুক, যতই রক্ত ঝরাক না কেন উদীচীর ধমনী কখনো রক্তশূন্য হবে না। বরং আরও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে দেশীয় দুঃশাসন আর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। চার দশকের গৌরবোজ্জল সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাবে মুক্তির নিশানায়।

# এ্যালবাম

শহীদ মিনারে বক্তৃতারত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কৃষক নেতা সত্যেন সেন।

Leading writer and peasant leader Satyen Sen addressing a rally at Central Shaheed Minar, Dhaka.

গৌরবময় ২৫ বছর
দশম জাতীয়

সাংস্কৃতিক

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

শিল্পী গোষ্ঠী
সংসদ

HOTEL RAMNA
১৩
রক্তস্নাত একতারাতে
বজ্রবীণা উঠুক বেজে
জাতীয় সম্মেলন
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

বিশ্বগ্রাসী দানবটাকে
পঞ্চদশ জাতীয়
২১ ও ২২ এপ্রিল ২০০৬
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী

বিশ্বগ্রাসী দানবটাকে
বিশ্বমানব দাঁড়াও রুখে
পঞ্চদশ
জাতীয়
সম্মেলন
২১ ও ২২ এপ্রিল ২০০৬
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

বন্দী শিবির থেকে
কবি শামসুর রাহমান এর
সংবর্ধনা ও আবৃত্তি
উদীচী

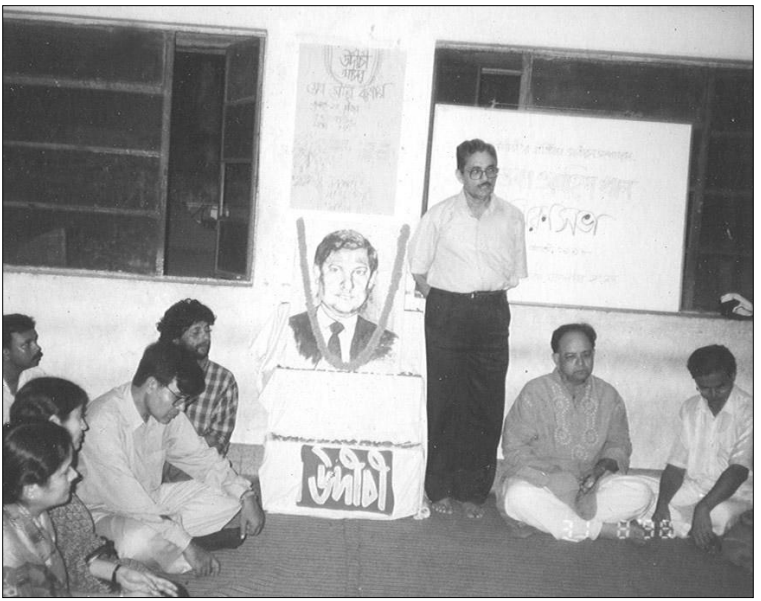

নজরুল

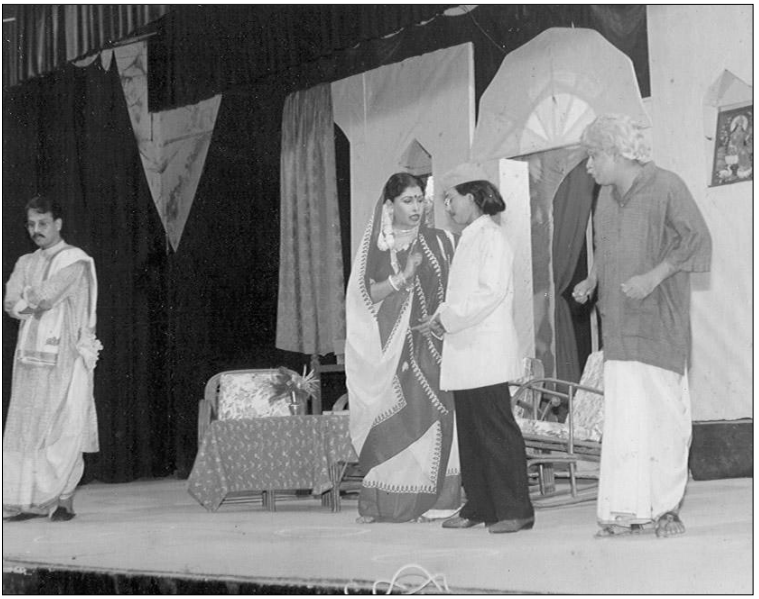

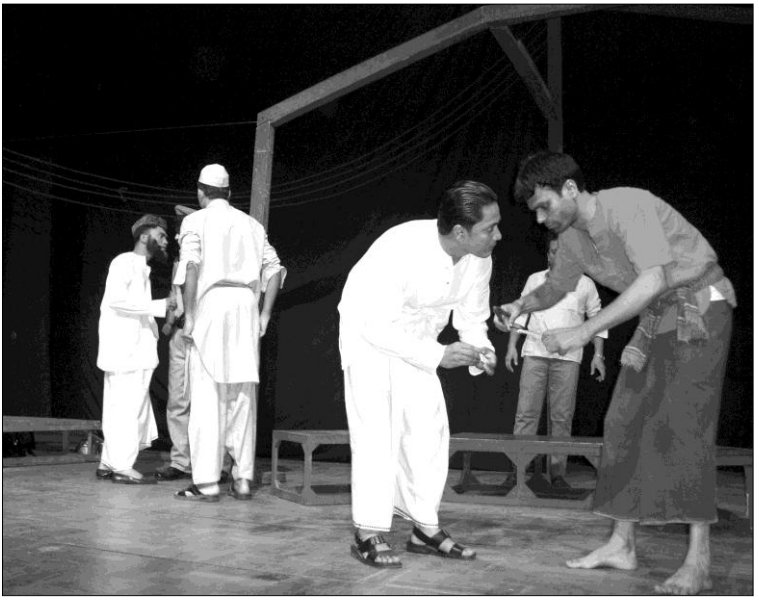

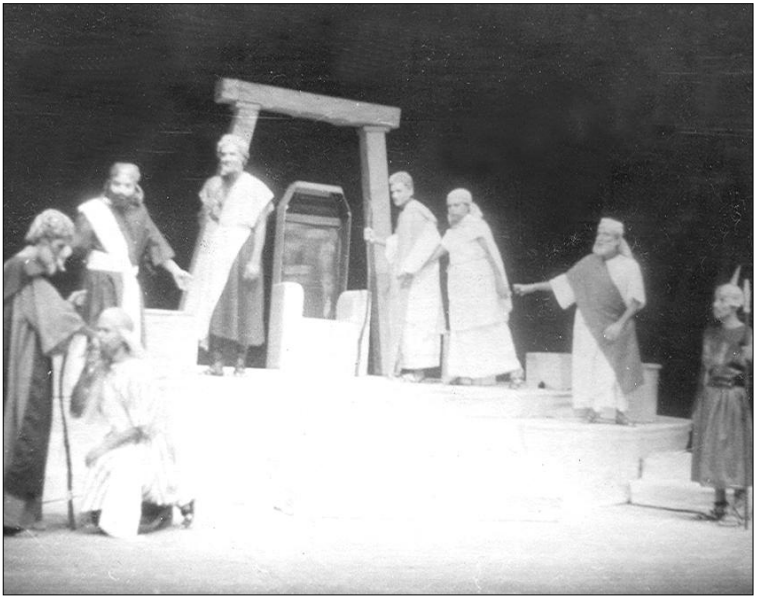

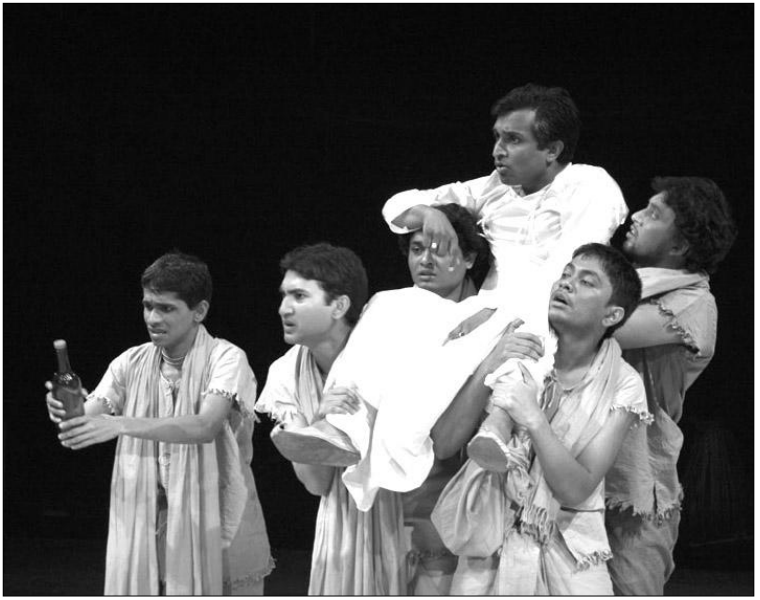

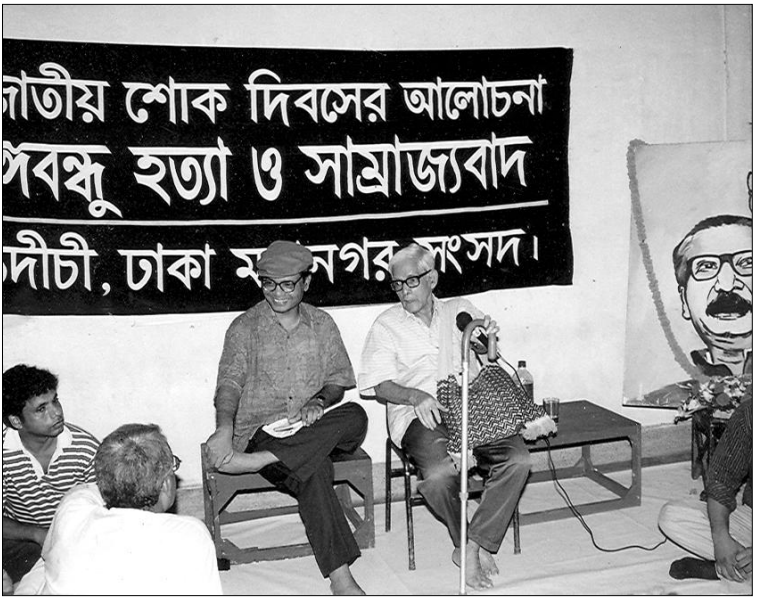

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা
ঙ্গবন্ধু হত্যা ও সাম্রাজ্যবাদ
দীচী, ঢাকা
নগর সংসদ।

বেরতিনদশ
দশ উদীচী শিল্পী

দ্রোহের বীণায় উঠুক বেজে
অসুর নাশী গান
জাতীয়
গণসঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও
সত্যেন সেন
গণসঙ্গীত

৪০তম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
এর
শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী
বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।

## প্যারাডাইস স্নেহনীড়

রানীর দিঘীর উত্তর পাড়

কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

আমাদের বিক্রয়যোগ্য প্রকল্প সমূহঃ

১। **প্যারাডাইস মারিয়া গার্ডেন**
প্লট নং-৮৭, রোড নং-৯,সি, সেক্টর-৫
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

২। **ইসলাম প্যারাডাইস**
৬/১১, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা।

৩। প্যারাডাইস আল-মদিনা
৫৬/৭/৫, উত্তর বাসাবো, ঢাকা।

৪। **প্যারাডাইস হেনা প্যালেস**
৩২/খ, মায়াকানন, ঢাকা

৫। প্যারাডাইস প্রশান্তি
১০৭৪, মালিবাগ বাজার, ঢাকা।

৬। **লতিফ'স প্যারাডাইস**
১৪, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।

৭। **প্যারাডাইস বাগান বিলাস**
৪৮৮, বাগানবাড়ী, মালিবাগ, ঢাকা।

৮। **প্যারাডাইস চামেলী**
৩২/১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।

৯। **প্যারাডাইস টিউলিপ**
১৯০, মধ্য বাসাবো, ঢাকা।

১০। **প্যারাডাইস ভূইয়া সেন্টার**
১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।

১১। **প্যারাডাইস গিয়াস কুঞ্জ**
৪১, শান্তিনগর, ঢাকা।

১২। **প্যারাডাইস হক ভিলা**
প্লট # ২০, রোড # ৯, ব্লক - সি
রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা।

১২। প্যারাডাইস পয়েন্ট
৩/১, উলন রোড, রামপুরা, ঢাকা।

৬০%
ঋণ সুবিধা

ডিবিএইচ, ন্যাশনাল হাউজিং, এন সি সি ব্যাংক, আই ডি এল সি হতে

PDCL

**প্যারাডাইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশনস্ লিঃ**

২৪/১, চামেলীবাগ (শান টাওয়ার, ৭ম তলা), শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৭৮৭১, ৯৩৩৬৬৬৮, ৯৩৫০১১২, মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩০২২৭২
০১৮১৯-৮৭৫৭১২, ০১১৯৯-১৫৮৮৩৮, ০১৮১৬-৯১৮৬৮৮

*Fax : 880-2-9347871-107, E-main: pdcl2005@yahoo.com, Website-www.pdclbd.com*

সদস্য রিয়াব

# evsjv‡`‡ki cÖMwZkxj mvs¯‹…wZK Av‡›`vj‡bi cw_K…Z D`xPx‡K Zvi msMÖv‡gi Pvi `k‡K ï‡f”Qv

**Corporate Office:**

Plot # I/1, Road # 06, Section # 07
Mirpur I/A, Dhaka-1216
Tel : 8033461, 8013883, 9007142, 9006747, 9006028 Ext. 221
Fax : 880-2-9007978, 9016994

E-mail : pro@epylliongroup.com
Web : www.epylliongroup.com

আমি কি বিদেশ থেকে প্রিয়জনের পাঠানো টাকা মিনিটেই*
বেসিক ব্যাংক থেকে গ্রহণ করতে পারবো ?
অবশ্যই!
কারণ আজ থেকে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা
দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বেসিক ব্যাংক-এর বিভিন্ন শাখা থেকে গ্রহণ করা যাবে
সহজেই কোন ব্যাংক একাউন্ট ছাড়াই।
WESTERN UNION
yes!
westernunion.com
মানি ট্রান্সফার
BASIC Bank Limited
Serving people for progress
A STATE OWNED SCHEDULED BANK